একক ৩ ❑ উপনিবেশবাদ ও উপনিবেশ বিস্তার

গঠন

৩.০ উদ্দেশ্য

৩.১ প্রস্তাবনা

৩.২ উপনিবেশবাদ বা সাম্রাজ্যবাদ বলতে কি বোঝায়

৩.৩ উপনিবেশবাদের বৈশিষ্ট্য

৩.৪ উপনিবেশবাদের বিভিন্ন পর্যায়

ক) প্রথম পর্যায় খ) দ্বিতীয় পর্যায় গ) তৃতীয় পর্যায়

৩.৫ উপনিবেশবাদের প্রকারভেদ— প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ

৩.৬ উপনিবেশ বিস্তারের ধারা

৩.৭ উপনিবেশ স্থাপনের নতুন প্রচেষ্টা

৩.৮ সারাংশ

৩.৯ অনুশীলনী

৩.১০ গ্রন্থপঞ্জী

৩.০ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করলে আপনি জানতে পারবেন—

উপনিবেশবাদ ও সাম্রাজ্যবাদ কথা দুটি কি অর্থে প্রয়োগ করা হয়।

উপনিবেশ ও ঔপনিবেশিক দেশের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক, উপনিবেশ বিস্তারের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয় ও অন্যান্য প্রেরণা।

আফ্রিকা, এশিয়া ও লাটিন আমেরিকার দেশগুলিতে কিভাবে উপনিবেশবাদ স্থাপিত হয়।

৩.১ প্রস্তাবনা

পনেরো শতকের শেষে ভৌগোলিক আবিষ্কারের ফলে বহির্বিশ্বে ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলি উপনিবেশ বিস্তার করে। অগ্রণী ভূমিকা নেয় আটলান্টিক তীরবর্তী দেশ— স্পেন, পর্তুগাল, হল্যান্ড, ইংল্যান্ড ও ফ্রান্স। উপনিবেশ বিস্তারের পিছনে মূল প্রেরণা ছিল ব্যবসা-বাণিজ্য, ধর্মপ্রচার, ভূমি দখল ও সম্পদ লুণ্ঠন। সেই দিক থেকে দেখতে গেলে উপনিবেশ বিস্তারের ইতিহাস পাঁচশ বছরের পুরানো।

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে আর একটু নির্দিষ্ট করে বলতে হলে ১৮৭০ সাল থেকে প্রথম বিশ্ব যুদ্ধের (১৯১৪) অন্তর্বর্তী সময়ে পশ্চিমের ধনতান্ত্রিক দেশগুলির মধ্যে উপনিবেশ স্থাপনের জন্য এক তীব্র রেষারেষি লক্ষ্য করা যায়। অল্প সময়ের মধ্যেই আফ্রিকা, এশিয়া ও ল্যাটিন আমেরিকার তখন পর্যন্ত অনধিকৃত স্বাধীন দেশে পুঁজিবাদি রাষ্ট্রের আধিপত্য স্থাপিত হয়। এ যুগের উপনিবেশ বিস্তারকে উপনিবেশবাদ বা সাম্রাজ্যবাদ আখ্যা দেওয়া হয়। আমাদের আলোচ্য বিষয় এই উপনিবেশবাদ বা সাম্রাজ্যবাদ।

উপনিবেশবাদ ও সাম্রাজ্যবাদ কথা দুটি সমার্থক। একই মুদ্রার এপিঠ ওপিঠ। উপনিবেশের (প্রান্ত periphery) দিক থেকে যা উপনিবেশবাদ, ঔপনিবেশিক দেশের (মাতৃভূমি, metropolis, centre, core) দিক থেকে তাই সাম্রাজ্যবাদ। আমাদের আলোচনায় উপনিবেশবাদ কথাটিই বেশি করে ব্যবহার করা হয়েছে।

সাম্রাজ্যবাদ সম্বন্ধে সাধারণ ধারণাগুলিকে ঐতিহাসিক ডেভিড টমসন চমৎকার করে ব্যাখ্যা করেছেন (দ্রষ্টব্য : David Thompson, *Europe since Nepoleon*)। তিনি বলেছেন যে ১৮১৫ সালের আগে প্রায় চারশত বছর পৃথিবী নিরবচ্ছিন্ন ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদকে প্রত্যক্ষ করেছে। এই সাম্রাজ্যবাদের অর্থ হল অন্যান্য মহাদেশগুলির ওপর ইউরোপীয় শক্তিগুলির ক্রম সম্প্রসারণশীল বিস্তার। এই বাহ্যিক বিস্তারই সাম্রাজ্যবাদ। স্পেনীয়, পর্তুগীজ, ওলন্দাজ, ফরাসী ও ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য একটার পর একটা চার শতাব্দী ধরে আত্মপ্রকাশ করেছে। এই যে অ-ইউরোপীয় দেশের মাটিতে ইউরোপীয় শক্তিগুলির দখল ও নিয়ন্ত্রণ তার নানা রূপ ছিল—ব্যবসা-বাণিজ্য, ধর্মপ্রচার, এডভেঞ্চার, বসতিবিস্তার, লুটতরাজ, জাতীয় অহংকার জনিত তাড়না, রাজ্যজয়, যুদ্ধ ইত্যাদি (এর সঙ্গে আমরা যোগ করতে পারি দাসব্যবসা—মানুষকে দাসত্বে বাঁধবার আকাঙ্ক্ষা)। ওপরে যে দেশের তালিকা দেওয়া হল তার দ্বারা সামুদ্রিক শক্তিগুলির সম্প্রসারণশীলতায় অগ্রণী ভূমিকা নেওয়ার বিষয়টি জোর দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এর দ্বারা এ বোঝায় না যে সাম্রাজ্যবাদী শক্তি হতে হলে শুধু সমুদ্রই পার হতে হবে। স্থলভাগ অতিক্রম করলে চলবে না। হ্যাপসবুর্গ ও অটোম্যান তুর্কীদের বিরাট বংশভিত্তিক সাম্রাজ্য (Dynastic empires), জার্মানদের বসতি ও বাণিজ্যের খোঁজে পূর্বদিকে বিস্তারের প্রথাগত অভ্যাস, নেপোলিয়নের মহাদেশীয় সাম্রাজ্য, উনিশ শতকে রাশিয়ার দ্রুত দক্ষিণ ও মধ্য এশিয়ায় বিস্তার। এমনকি আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের পশ্চিম দিকে বিস্তার সমুদ্র পার না হয়েও মহাদেশীয় স্থলপথে সাম্রাজ্য বিস্তারের নজির। অতএব ১৮৭০ সালে (বা তার আগে পরে সামান্য সময়ে) ইউরোপীয় শক্তিগুলির পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চল দখলের প্রচেষ্টার মধ্যে কোন অভিনবত্ব ছিল না। তা সত্ত্বেও 'সাম্রাজ্যবাদ' (imperialiam) কথাটা উনিশ শতকের মধ্যভাগেই আবিষ্কৃত হয়েছিল। ১৮৭০ সালের পরবর্তী প্রজন্মের সময়কালকেই 'সাম্রাজ্যবাদের যুগ' ('Age of Imperialism') বলা হয়।

৩.২ উপনিবেশবাদ বা সাম্রাজ্যবাদ বলতে কি বুঝায়

উপনিবেশবাদ বা সাম্রাজ্যবাদের একটি অর্থনৈতিক ব্যাখ্যা দেন দাদাভাই নৌরজী, রমেশচন্দ্র দত্ত প্রভৃতি ভারতীয় মনীষীগণ। তাঁরা দেখিয়েছেন ভারতীয় উপনিবেশ থেকে প্রতি বছর বিপুল পরিমাণ অর্থ ইংলন্ডে রপ্তানি হয় অথচ পরিবর্তে ভারতবর্ষের সমানুপাতিক কোন ফললাভ হয় না। ভারত শাসনের জন্য ইংলন্ডে ব্যয়, ব্রিটিশ কর্মচারিদের ভাতা ও পেনসন, ভারতে নিয়োজিত ব্রিটিশ মূলধনের মুনাফা ইত্যাদির মাধ্যমে প্রতিবছর বিপুল পরিমাণ সম্পদ ভারতবর্ষ থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে ইংলন্ডে সঞ্চিত হত। সামাজিক উদ্বৃত্ত উপনিবেশের উন্নয়নে

বিনিয়োগ না করে মাতৃভূমিতে (metropolis) সঞ্চিত হত অথবা বিনিয়োগ করা হত। একে তাঁরা বলেছেন সম্পদের বহির্নিষ্কাষণ (Drain of wealth)। এটি সাম্রাজ্যবাদের একটি অর্থনৈতিক ফল।

মার্কস্ এঙ্গেলস উপনিবেশবাদ বা সাম্রাজ্যবাদ সম্পর্কে সবিস্তারে ভাষ্য সম্বলিত কোন তত্ত্ব লিখে যান নি, যদিও তাঁদের লেখায় ইংলন্ডের উপনিবেশ, আয়ারল্যান্ডের শোষণের উল্লেখ আছে। মার্কস্ এর মূলধনীতত্ত্বের উপর ভিত্তি করে পরবর্তীকালে জে. এ. হবসন, লেনিন প্রভৃতি চিন্তাবিদরা সাম্রাজ্যবাদের তত্ত্ব খাড়া করেছেন।

ব্রিটিশ অর্থনীতিবিদ হবসন (J. A. Hobson) তাঁর ১৯০২ সালে প্রকাশিত *Imperialism : A Study* গ্রন্থে দেখিয়েছেন যে সাম্রাজ্যবাদের উদ্ভবের জন্য ধর্মীয়, রাজনৈতিক ও অন্যান্য যে কারণই থাক না কেন মূল প্রেরণা এসেছিল পশ্চিমের উন্নত ধনতান্ত্রিক দেশগুলির উদ্বৃত্ত পুঁজির বিনিয়োগের তাগিদ থেকে। মার্কসের ব্যাখ্যা অনুসরণ করে তিনি দেখিয়েছেন পুঁজিবাদের বৈশিষ্ট্যই হচ্ছে অতিরিক্ত মুনাফার জন্য বিনিয়োগ করা। বেশি বেশি মুনাফার জন্য পুঁজিপতিদের চাহিদা ছিল সস্তায় কাঁচামাল সংগ্রহ, শিল্পজাত পণ্যের বাজার ও মূলধন লগ্নী করার নতুন নতুন ক্ষেত্র। উপনিবেশ বিস্তারের দ্বারাই এই সব চাহিদা মেটানো সম্ভব। এইভাবে সাম্রাজ্যবাদের উদ্ভব।

হবসনের তত্ত্বকেই আরও সম্প্রসারিত করে লেনিন ১৯১৬ সালে Imperialism : the Highest Stage of Capitalism নামক পুস্তিকা প্রকাশ করেন। হবসনের মতই তিনিও ইউরোপের পুঁজিবাদী দেশগুলির বহির্বিশ্বে মূলধন বিনিয়োগের তাগিদের ব্যাখ্যা দিয়েছেন। পুঁজিবাদী শ্রেণী কখনই তাদের উদ্বৃত্ত মূলধন নিজের দেশের সাধারণ লোকের মান উন্নয়নের জন্য ব্যয় করে না—সেক্ষেত্রে তাদের মুনাফা কমে যাবে। অন্য দিকে সাধারণ লোকের ক্রয় ক্ষমতা যথেষ্ট না থাকায় (কৃষির আয়ের স্বল্পতার জন্য) নিজের দেশেও বিক্রি করতে পারে না। উনিশ শতকের শেষ পর্বে ইউরোপের অন্য দেশেও শিল্প বিপ্লবের অগ্রগতির জন্য শিল্পপণ্যের বাজার এবং বিনিয়োগের ক্ষেত্র সঙ্কুচিত হয়ে এসেছিল। ফলে যথেষ্ট মুনাফা সঞ্চয়ের তাগিদে অনুন্নত দেশে পুঁজি বিনিয়োগের তাগিদ দেখা দেয়। এইভাবে উপনিবেশের বিস্তার ঘটে। লেনিনের শিল্পে নিযুক্ত পুঁজির বদলে অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করে মূলধনী পুঁজির ওপর। তাঁর প্রতিপাদ্য বিষয় হল পুঁজিবাদই চূড়ান্ত রূপ পায় সাম্রাজ্যবাদের মধ্যে। মূলধনীরা উদ্বৃত্ত মূল্যের বুনিয়াদ রক্ষা করতে উদ্বৃত্ত মূল্যের ভগ্নাংশ খরচ করে নিজের দেশের শ্রমিকদের মধ্যে একটা অভিজাত শ্রেণী গড়ে তোলে এবং তাদের দিয়ে শ্রমিকদের বাকী অংশের ওপর প্রভাব বিস্তার করে। এইভাবে শ্রমিক শ্রেণীকেও উপনিবেশ বিস্তারের শরিক করে নেয়।

ইমানুয়ের ওয়ালারস্টাইন (Immanuel Wallerstein) ধনতান্ত্রিক বিশ্ব অর্থনীতি ব্যবস্থার নতুন ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তাঁর মতে ধনতান্ত্রিক বিশ্ব অর্থনীতি কেন্দ্র (Centre Core) এবং প্রান্ত (periphery) দুটি অংশে বিভক্ত। কেন্দ্রে আছে মাতৃভূমি (metropolis) এবং প্রান্তে উপনিবেশ। কেন্দ্র প্রান্ত বিভাজনের কয়েকটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য আছে।

প্রথমত, কেন্দ্রে উচ্চ মূল্যের পণ্য উৎপন্ন হয় আর প্রান্তের উৎপাদন প্রযুক্তি নিম্নমানের, শ্রমিকের মজুরীও খুব কম।

দ্বিতীয়ত, অসম পণ্য বিনিময়ের ফলে প্রান্ত থেকে কেন্দ্রে সব সময়ই রপ্তানি উদ্বৃত্ত হয়।

তৃতীয়ত, মাতৃভূমি দেশগুলি সবসময়ই শক্তিশালী আর প্রান্ত বা উপনিবেশগুলি দুর্বল।

চতুর্থত, প্রান্তের অর্থনীতি মাতৃভূমির অর্থনীতির সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত।

মূলকথা, কেন্দ্র ও প্রান্ত উভয়ে মিলেই বিশ্বধনতন্ত্র গড়ে উঠেছে।

৩.৩ উপনিবেশবাদের বৈশিষ্ট্য

ওপরের আলোচনা পড়ে আপনি উপনিবেশবাদের যে কয়েকটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করেছেন তাকে নিম্নলিখিত যুক্তিনির্ভর সোপানে সাজানো যায়।

প্রথম, উপনিবেশগুলি বিশ্ব ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়ে। অবশ্য বিশ্ব ধনতন্ত্রের সঙ্গে যুক্ত হলেও উপনিবেশের অর্থনীতি ও সমাজ মাতৃভূমির (metropolis) অর্থনীতি সমাজের ওপর পুরোপুরি নির্ভরশীল ছিল। অর্থাৎ মাতৃভূমির স্বার্থেই উপনিবেশের অর্থনীতি ও সমাজ নিয়ন্ত্রিত হত। মাতৃভূমির সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে উপনিবেশের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কাঠামোরপরিবর্তন হয়।

দ্বিতীয়, ঔপনিবেশিক দেশ (metropolis)-এর স্বার্থেই উপনিবেশ কৃষি ও খনিজ দ্রব্য উৎপাদন করা হত। নিজের দেশের শিল্পের সঙ্গে এই সব প্রাথমিক দ্রব্যের কোন যোগ ছিল না।

তৃতীয়, উপনিবেশ এবং ঔপনিবেশিক দেশের মধ্যে বাণিজ্য সব সময়ই অসম ছিল এবং মাতৃভূমির (metropolis) অনুকূলে ছিল। এই ভবে প্রচুর সম্পদ উপনিবেশ থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে মাতৃভূমিতে চলে আসত।

চতুর্থ, উপনিবেশগুলির ওপর ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র বা মাতৃভূমির রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ বজায় থাকত।

৩.৪ উপনিবেশ বিস্তারের বিভিন্ন পর্যায়

উপনিবেশ বিস্তারের ইতিহাসকে সাধারণভাবে তিনটি পর্যায়ে ভাগ করা যায়। পর্যায়গুলি কালানুক্রমিক। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে একাধিক পর্যায়ের সহাবস্থান লক্ষ্য করা যায়। আবার কোথাও কোথাও সব পর্যায়ের অবস্থান নাও থাকতে পারে। মাতৃভূমির নিজস্ব রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক কাঠামোর ওপর পরিবর্তনের পর্যায় নির্ভর করে। উপনিবেশের নিজস্ব ঐতিহাসিক অবস্থান ও পর্যায় নির্দিষ্ট করে।

ক) প্রথম পর্যায় :

এই সময়ে উপনিবেশ থেকে পণ্য কিনে ইউরোপের বাজারে রপ্তানি করা হত। অন্য ইউরোপীয় কোম্পানিগুলিকে প্রতিযোগিতা থেকে দূরে সরিয়ে রাখার জন্য একচেটিয়া বাণিজ্যের অধিকার প্রতিষ্ঠা করা হয়। একই সময়ে রাজনৈতিক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার প্রক্রিয়া শুরু হয়। উপনিবেশের বাজারে ইউরোপীয় পণ্যের যথেষ্ট চাহিদা না থাকায় এবং যে যুগের বাণিজ্যিক তত্ত্ব অনুসারে বিদেশে সোনা রূপো রপ্তানিতে অনিচ্ছা থাকায় উপনিবেশেই রাজস্ব ও কর সংগ্রহ করে উপনিবেশের পণ্য কেনা হত। এই পর্যয়ে রাজনৈতিক কর্তৃত্বের সুযোগ নিয়ে উপনিবেশে উৎপাদন ব্যবস্থার ওপর প্রভাব বিস্তার করা হত।

প্রাথমিক পর্যায়ে উপনিবেশের রাষ্ট্র কাঠামো বিচারব্যবস্থা, শিক্ষা ও ধর্মে হস্তক্ষেপ করার প্রয়োজন দেখা দেয় নি। ব্যবসার মাধ্যমে সামাজিক উদ্বৃত্ত আহরণের জন্য এই ধরণের হস্তক্ষেপের দরকার ছিল না।

খ) দ্বিতীয় পর্যায় :

উপনিবেশকদের দ্বিতীয় পর্যায় হল অবাধ বাণিজ্যের যুগ। উনিশ শতকের শুরুতে ব্রিটেনে বাণিজ্যিক পুঁজি শিল্পপুঁজিতে উত্তরণ ঘটে। নতুন শিল্প পুঁজিবাদীরা উপনিবেশ থেকে বেশি করে কর বা শুল্ক আদায় করে অথবা

লুণ্ঠন করে বাণিজ্যিক সুবিধাভোগের বিরোধী ছিল। তারা চাইত মাতৃভূমির শিল্পজাত দ্রব্য উপনিবেশে বিক্রি করতে এবং সেখান থেকে সস্তায় কাঁচামাল সংগ্রহ করতে। বাণিজ্যের ওপর বাধা নিষেধ (Tariff) উঠে গেলে তাদের পক্ষে শিল্পজাত পণ্য সস্তায় উপনিবেশে বিক্রি করা সহজ হবে। কেননা উপনিবেশের কুটির শিল্পজাত দ্রব্যপণ্য কখনই তাদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় দাঁড়াতে পারতো না। এইভাবেই ভারত বস্ত্র রপ্তানিকারী দেশ থেকে উনিশ শতকে বস্ত্র আমদানিকারী দেশে পরিণত হয়। ভারতে অবশিল্পায়ন (deindustrialisation) ঘটে। কারিগররা হয় জমিতে ফিরে গিয়ে কৃষি নির্ভর হয়ে পড়ে নতুবা কাজের ও খাদ্যের অভাবে মারা যায়। ভারতের প্রধান প্রধান শিল্পকেন্দ্রগুলির যেমন ঢাকা, সুরাট, মুর্শিদাবাদের দ্রুত অবক্ষয় হয়।

দ্বিতীয় পর্যায়ে উপনিবেশিক রাষ্ট্রের লক্ষ্য হচ্ছে উপনিবেশে কৃষিকাজের উন্নতি করা যাতে তাদের কলকারখানার কাঁচামালের জন্য অন্য কোন দেশের ওপর নির্ভর করতে না হয়। এই সময়ে কৃষিতে বাণিজ্যিক শস্যে যেমন নীল, আফিং ইত্যাদিতে এবং আরও বিশেষ করে বাগিচা শিল্পে—চা, কফি, রবার, ইত্যাদিতে পুঁজি বিনিয়োগ করা হয়। শাসনব্যবস্থা, বিচারবিভাগ, শিক্ষা, সংস্কৃতিতে পরিবর্তন ঘটানো হয়। মাতৃভূমিতে উৎপন্ন শিল্পজাত দ্রব্যের চাহিদা বাড়াতে আধুনিকীকরণ ও পাশ্চাত্যকরণের উপর জোর দেওয়া হয়। দূর দূর অঞ্চল থেকে কাঁচামাল সংগ্রহ করতে ও শিল্পজাত দ্রব্য পৌঁছে দিতে রেললাইনের প্রবর্তন করা হয়।

এ যুগের মূল মন্ত্র ছিল উদারনৈতিক সাম্রাজ্যবাদ। পুরানো শাসনব্যবস্থার পরিবর্তন করে স্বায়ত্তশাসনের অধিকার দেওয়া হতে থাকে। এমন কথাও বলা হতে থাকে যে ভবিষ্যতে উপনিবেশগুলি স্বাধীনতা পাবে এবং পূর্বতন উপনিবেশ ও উপনিবেশিক রাষ্ট্রের মধ্যে পারস্পরিক লাভজনক বাণিজ্য সম্পর্ক গড়ে উঠবে।

গ) তৃতীয় পর্যায় :

উনিশ শতকের শেষ পর্বে বিশ্ব ধনতন্ত্রে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন আসে। ফ্রান্স, জার্মানি, বেলজিয়াম, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি দেশে দ্রুত শিল্পায়ন ঘটে। পৃথিবীর বাজারে ব্রিটেনের একচেটিয়া আধিপত্যের অবসান হয়। ইউরোপে শিল্পজাত পণ্যের বাজারের সঙ্কোচন হয়। অন্যদিকে ধনতান্ত্রিক পুঁজিপতিদের হাতে প্রচুর বিনিয়োগযোগ্য মূলধন সঞ্চিত হয়। ফলে নতুন নতুন একচেটিয়া বিনিয়োগ ক্ষেত্র ও তৎসংলগ্ন প্রভাব মণ্ডল (exclusive sphere of influence) খুঁজে বার করার চেষ্টা হয়।

উপনিবেশগুলির ওপর এই সময় রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ কঠোর করা হয়। আমলাতন্ত্রের কর্তৃত্ব দৃঢ় করা হয় যাতে মাতৃভূমির পুঁজি বিনিয়োগের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করা যায়। স্বায়ত্তশাসনের কথা আর শোনা যায় না। বরং প্রজাহিতৈষী স্বৈরাচারের কথা বলা হয়। উপনিবেশের অধিবাসীরা যেন মাতৃভূমি রাষ্ট্রের সন্তান—তাদের সুখ দুঃখ দেখার দায়িত্ব মাতৃভূমির রাষ্ট্রেরই হাতে।

উপনিবেশবাসীর ক্রয় ক্ষমতা সীমিত থাকায় সেখানে শিল্পে পুঁজি বিনিয়োগের বিশেষ সম্ভাবনা ছিল না। কোন মৌল শিল্পে লগ্নীকরণ করা হয় নি—কেবল সেই সব শিল্পের বিকাশ হয় যেগুলির বিদেশে বাজার ছিল। ক্রম বর্ধমান দারিদ্র ও রাজনৈতিক দমনের মুখে উপনিবেশগুলিতে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলন দানা বাঁধতে থাকে।

৩.৫ উপনিবেশবাদের প্রকারভেদ — প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ

প্রত্যক্ষ উপনিবেশবাদ : প্রত্যক্ষ উপনিবেশবাদ সেইসব উপনিবেশের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যেখানে উপনিবেশিক রাষ্ট্রের (metropolis) পুরোপুরি রাজনৈতিক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ইংলন্ড, ফ্রান্স, স্পেন, পর্তুগাল-এর পুরানো উপনিবেশগুলি উনিশ শতকে স্থাপিত আফ্রিকায় উপনিবেশগুলি এবং ফ্রান্স অধিকৃত ইন্দোচীন এবং ওলন্দাজ অধিকৃত ইন্দোনেশিয়া প্রত্যক্ষ উপনিবেশের উদাহরণ। সবচাইতে ভাল উদাহরণ ভারতবর্ষ। এখানে উপনিবেশবাদের সব বৈশিষ্ট্য ও পর্যায়গুলিই উপস্থিত ছিল। প্রত্যক্ষ উপনিবেশবাদের ব্যতিক্রমী উদাহরণ মিশর। আপাতদৃষ্টিতে মিশর ছিল অটোমান সাম্রাজ্যের একটি প্রদেশ। এখানকার শাসক ছিলেন খেদিভ। কিন্তু খেদিভের ওপর ইংলন্ডের পুরোপুরি রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হয়। সুয়েজখাল আন্তর্জাতিক জাহাজ চলাচলের জন্য খুলে দিলে (১৮৬৯) এবং উনিশ শতকে ছয়ের দশকে আমেরিকায় গৃহযুদ্ধ শুরু হলে মিশরের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির দুটি উৎস তুলো চাষ ও সুয়েজখালের রাজস্ব ইংলন্ডের পুঁজিপতিদের নিয়ন্ত্রণে চলে যায়। ১৮৮২ সালে মিশরকে ইংলন্ডের উপনিবেশ বলে ঘোষণা করা হয়। যদিও তারপরেও খেদিভের শাসন বহাল থাকে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সূচনায় (১৯১৪) মিশরকে ইংলন্ডের অধীন রাজ্য (protectorate) বলে ঘোষণা করা হয়।

পরোক্ষ উপনিবেশবাদ : পরোক্ষ উপনিবেশে স্থানীয় শাসকদের রাজনৈতিক অধিকার বজায় থাকে, কিন্তু অর্থনৈতিক অধিকার উপনিবেশিক দেশের হাতে চলে যায়। সাম্রাজ্যবাদীরা অনেক সময় ঐসব দেশে নিজেদের 'একচেটিয়া প্রভাব এলাকা' স্থাপন করে স্বদেশের পুঁজিপতিদের পরিবহন, শিল্প, খনি, বাগিচা অথবা ব্যাঙ্কিং-এ মূলধন বিনিয়োগের সুযোগ করে দেয়। পরোক্ষ উপনিবেশে স্থানীয় শাসকরা যত দুর্বল ও অপদার্থই হোক না কেন তাদের শাসন টিকিয়ে রাখা হয় কারণ পরোক্ষ উপনিবেশ প্রত্যক্ষ উপনিবেশের চেয়ে ব্যয় সাশ্রয়কারী (cost effective)। পরোক্ষ উপনিবেশবাদ প্রধানত পৃথিবীর চারটি দেশে কায়েম হতে দেখা যায়— চীন, অটোমান সাম্রাজ্য, ল্যাটিন আমেরিকা ও ইরানে। চীন ও অটোমান সাম্রাজ্যের কথা একটু করে আলোচনা করা হয়েছে। এখানে আপনি ল্যাটিন আমেরিকা ও ইরানের কথা সংক্ষেপে জেনে নিন।

মধ্য ও দক্ষিণ আমেরিকার দেশ নিয়ে ল্যাটিন আমেরিকা। উনিশ শতকের প্রথম দুই দশকে স্পেন ও পর্তুগালের কাছ থেকে এরা স্বাধীনতা লাভ করে। তখন দেশগুলির সংখ্যা ছিল নয়। পরে সীমান্ত পরিবর্তন করে এদের সংখ্যা হয় কুড়ি। ইতিহাসের পরিহাস যে এরা যে মুহূর্তে স্বাধীনতা লাভ করেছিল সে মুহূর্ত থেকেই নতুন সাম্রাজ্যবাদ এদের ওপর জগদ্দলের মত চেপে বসে। এ ব্যাপারে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। কারণ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রই সবচেয়ে কাছের শিল্পোন্নত দেশ। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রই মনরো নীতির (১৮২৩) দ্বারা ঘোষণা করে যে সে আমেরিকা মহাদেশে ইউরোপীয় দেশগুলির নতুন করে সাম্রাজ্যবিস্তারে বাধা দেবে। আমেরিকা নিজেই কিছুদিন আগে (১৭৭৬) ইংলন্ডের উপনিবেশিক শাসন থেকে স্বাধীনতা পেয়েছিল। ফলে তার পক্ষে অল্প সময়ের ব্যবধানে অন্যদেশে প্রত্যক্ষ উপনিবেশ স্থাপন করা দৃষ্টিকটু হত। ল্যাটিন আমেরিকার দেশগুলি ছিল খনিজ (সোনা, লোহা, ফসফেট, প্লাটিনাম, তেজস্ক্রিয় radioactive ধাতু ইত্যাদি) এবং কৃষিজ (আখ, কফি ইত্যাদি) সম্পদে সমৃদ্ধ। কিছু স্থানীয় সহযোগী ব্যক্তির সাহায্যে (Compradors) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মূলধনী শ্রেণী দক্ষিণ আমেরিকার খনি ও কৃষিতে পুঁজি বিনিয়োগ করে এবং রেলপথ স্থাপন করে ঐ সমস্ত সম্পদ আহরণ করতে থাকে। এইভাবে ল্যাটিন আমেরিকায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পরোক্ষ উপনিবেশ স্থাপিত হয়।

ইরান— মধ্যযুগে ইরান (আগের নাম পারস্য) অটোমান সাম্রাজ্যের মতই সমৃদ্ধ ও বিস্তৃত ছিল। ষোল শতকে ইউরোপীয় বণিকরা বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে সেখানে এলে ইরানীরা তাদের অভ্যর্থনা জানায়। উনিশ শতকে

রাশিয়ার সাম্রাজ্য ইরানের সীমান্ত পর্যন্ত সম্প্রসারিত হলে ইংলন্ড তার ভারতবর্ষের উপনিবেশের নিরাপত্তা নিয়ে শঙ্কিত হয়ে পড়ে। রাশিয়া ও ইংলন্ডের পারস্পরিক রেষারেষি কাজে লাগিয়ে ইরান তার রাষ্ট্রিক স্বাধীনতা বজায় রাখতে সফল হয়। কিন্তু ইরানের অর্থনীতি এই দুই শিল্পোন্নত দেশের নিয়ন্ত্রণে চলে যায়। এইভাবে ইরানে পরোক্ষ সাম্রাজ্যবাদ প্রতিষ্ঠিত হয়।

ওপরের আলোচনা থেকে আপনি উপনিবেশবাদ কথাটির অর্থ, বৈশিষ্ট্য, উপনিবেশবাদের পর্যায় ও প্রকার সম্পর্কে ধারণা করতে পেরেছেন। এও জেনেছেন যে উপনিবেশবাদ কথাটি সাধারণভাবে উনিশ শতকের দ্বিতীয় অর্ধে উপনিবেশ বিস্তারের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। কিন্তু ঐ সময় পুরানো উপনিবেশগুলিতেও উপনিবেশবাদের সব বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পায়।

৩.৬ উপনিবেশ বিস্তারের ধারা

আপনারা হবসন ও লেনিনের দেওয়া উপনিবেশবাদ বা সাম্রাজ্যবাদের অর্থনৈতিক ব্যাখ্যা ইতিপূর্বে পড়েছেন। ঐসব অভিমত গুরুত্বপূর্ণ হলেও উপনিবেশ বিস্তারের সম্পূর্ণ কারণ বলে অনেকেই মনে করেন না। শিল্পের জন্য কাঁচামাল সংগ্রহ, শিল্পজাত পণ্যের বাজার বা উদ্বৃত্ত পুঁজির বিনিয়োগের তাগিদই যদি উপনিবেশ বিস্তারের কারণ হয় তবে, অনেক ঐতিহাসিক প্রশ্ন করেন, উনিশ শতকের ইউরোপীয় জনমত অনেক ক্ষেত্রে কেন উপনিবেশ বিরোধী মনোভাব পোষণ করত। ঐ শতকের একটু আগে ব্রিটিশ অর্থনীতিবিদ অ্যাডাম স্মিথ আমেরিকার তেরোটি উপনিবেশের স্বাধীনতা ঘোষণাকে স্বাগত জানিয়েছিলেন। তাঁর যুক্তি হল তথাকথিত সুবিধার চেয়ে উপনিবেশের বোঝা অনেক ভারী। বেন্থাম ফ্রান্সকে তার উপনিবেশগুলিকে স্বাধীনতা দেবার জন্য আবেদন জানিয়েছিলেন। কবডেন অবাধ বাণিজ্য ও সব বাণিজ্যিক সুযোগ-সুবিধার অবসান চেয়েছিলেন। ১৮৬১ সালে ফ্রান্স অবাধ বাণিজ্যের জন্য তার উপনিবেশের সব দরজা খুলে দিয়েছিলেন। গ্ল্যাডস্টোন আশা করেছিলেন ইংলন্ড তার উপনিবেশগুলিকে অচিরেই স্বাধীনতা দেবে। ডিসরেলিও অনেকদিন পর্যন্ত এইমত সমর্থন করেন। হবসন লেনিন ধনতান্ত্রিক উদ্বৃত্ত মূলধনের যে যুক্তি দেখিয়েছেন, ডেবিড টমসন তাকে খণ্ডন করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন ফ্রান্স, ইংলন্ড তাদের উদ্বৃত্ত পুঁজি উপনিবেশে বিনিয়োগ না করে সিংহভাগই ইউরোপে বা আমেরিকায় বিনিয়োগ করেছে। ফ্রান্স রাশিয়াতে যে অর্থ বিনিয়োগ করেছিল তার পরিমাণ ছিল অন্যান্য সমস্ত উপনিবেশে বিনিয়োগের তুলনায় দ্বিগুণ। ডেভিড টমসন তাই বলেছেন উপনিবেশ বিস্তারের পিছনে অর্থনৈতিক কারণের সঙ্গে রাজনৈতিক ও অন্যান্য কারণের সহাবস্থান ছিল।

উনিশ শতকে সাতের দশক থেকে ইউরোপের অনেক দেশে বুদ্ধিজীবী, অর্থনীতিবিদ, দেশপ্রেমিক, সাংবাদিক ও রাজনীতিবিদরা ছোট ছোট গোষ্ঠী করে সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টি করে। সাম্রাজ্যবাদী নীতি গ্রহণ করার জন্য কোনো দেশ সাম্রাজ্যবাদী হবে কি না হবে অনেক ক্ষেত্রে নির্ভর করত ঐসব গোষ্ঠীর তৎপরতার ওপর। ঐসব ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর সঙ্গে কোন বিশেষ রাজনৈতিক দলের সম্পর্ক ছিল না। বেলজিয়মে উদ্যোগ নিয়েছিলেন স্বয়ং সেখানকার রাজা দ্বিতীয় লিয়পোল্ড। ইংলন্ড ও জার্মানিতে রক্ষণশীল দল সাম্রাজ্য বিস্তারে আগ্রহী ছিল। ইংলন্ডে চরমপন্থী মতাদর্শী যোশেফ চেম্বারলেন ও উদারপন্থী লর্ড রোজবেরী রক্ষণশীলদের সমর্থনে এগিয়ে এসেছিলেন। ফ্রান্সের জুল ফেরী (Jules Fery) এবং লিয়ঁ গামবেটার (Leon Gambetta) মত চরমপন্থী প্রজাতন্ত্রীরা সাম্রাজ্য বিস্তারে সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছিলেন। ইটালিতে এগিয়ে এসেছিলেন উদারপন্থী নেতা ডেপ্রেটিস (Depretis) এবং ফ্রান্সসেসকো ক্রিসপি (Francesco Crispi) রাশিয়ার ক্ষেত্রে এই দায়িত্ব নিয়েছিল সামরিক নেতা ও আমলা শ্রেণী।

উপনিবেশ বিস্তারে খ্রীস্টান মিশনারিদের বিশেষ ভূমিকা ছিল। এদের মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত ছিলেন স্কটল্যান্ডে অধিবাসী ডেভিড লিভিংস্টোন। লন্ডন মিশনারি সোসাইটি তাঁকে আফ্রিকা পাঠিয়েছিল। কিন্তু ধর্মপ্রচারের চেয়েও তাঁর বেশি আগ্রহ ছিল বাণিজ্য বিস্তারে ও দুঃসাহসিক অভিযানে। নীল নদের উৎস সন্ধান করতে গিয়ে তিনি কিছুদিনের জন্য পথ হারিয়ে ফেলেছিলেন। তখন তাঁকে খুজে বার করতে পাঠানো হয়েছিল স্ট্যানলিকে। স্ট্যানলি তাঁকে ট্যাঙ্গানাইকা হ্রদের উপকূলে খুঁজে পান। ধর্মপ্রচারে ইংলন্ডের চেয়েও এগিয়ে ছিল ফ্রান্স। তৃতীয় প্রজাতন্ত্রের সময় প্রায় চল্লিশ হাজার ফরাসি মিশনারি আফ্রিকা ও পৃথিবীর অন্যান্য প্রান্তে ছড়িয়ে পড়ে। তাঁরা ধর্মপ্রচার ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে উপনিবেশ বিস্তারেও সাহায্য করে। ফরাসী মিশনারি কার্ডিনাল লাভেজারী (Cardinal Lavegeri) আলজেরিয়ায় Society of African Mission গঠন করেন এবং আলজেরিয়া থেকে টিউনিসিয়ায় তার কর্মক্ষেত্রে সম্প্রসারিত করেন। টিউনিসিয়ার ফরাসী আধিপত্য স্থাপনে তাঁর ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। চীনে দুজন জার্মান জেসুইট ধর্মপ্রচারক নিহত হওয়ার ঘটনাকে কেন্দ্র করে জার্মানি ১৮৯৭ সালে কিয়াওটাও বন্দর দখল করে নেয়।

ইউরোপে উনিশ শতকের শেষ অর্ধে সামরিক সংঘাতের প্রবল সম্ভাবনা ছিল। পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে নৌঘাঁটি স্থাপন করে সামরিক সুবিধা লাভের জন্যও উপনিবেশ বিস্তার প্রয়োজনীয় ছিল। তা ছাড়া উদ্বৃত্ত জনসংখ্যার চাপ এড়াতে (জার্মানি ও ইটালির ক্ষেত্রে) অথবা জনসংখ্যা বৃদ্ধি করার জন্য (ফ্রান্সের ক্ষেত্রে) বিভিন্ন দেশ উপনিবেশ বিস্তারে সক্রিয় হয়।

সব শেষে উপনিবেশ বিস্তারে দক্ষ প্রশাসন ও সৈনিকদের ভূমিকার উল্লেখ করতে হয়। তাঁরা আফ্রিকার বহু দেশে জটপাকানো প্রশাসনিক অবস্থা থেকে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে এগিয়ে এসেছিলেন। এদের মধ্যে মিশরে লর্ড ক্রোমার, দক্ষিণ আফ্রিকায় লর্ড মিলনার এবং জার্মান পূর্ব আফ্রিকায় লর্ড পিটার্সের নাম উল্লেখযোগ্য। এই ধরনের মানুষ ছাড়া আফ্রিকায় ইউরোপীয় উপনিবেশগুলি সংহত করা অসম্ভব ছিল।

ওপরের আলোচনা থেকে আমরা এই সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে উনিশ শতকের শেষ পর্বে উপনিবেশ বিস্তারের প্রেরণার উৎস ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন রূপে বর্তমান ছিল। অর্থনৈতিক রাজনৈতিক বা অন্য কোন একটি কারণে উপনিবেশ স্থাপিত হয়নি।

৩.৭ উপনিবেশ স্থাপনের নতুন প্রচেষ্টা

আপনারা জানেন পনেরো শতকের শেষে ভৌগোলিক আবিষ্কারের পর (কলম্বাসের আমেরিকা আবিষ্কার, ১৪৯২, ভাস্কো-ডা-গামার জলপথে ভারত আগমন, ১৪৯৮) বহির্বিশ্বে ইউরোপীয় উপনিবেশ স্থাপনের সূচনা হয়। স্পেন, পর্তুগাল, ফ্রান্স, ইংলন্ড, হল্যান্ড প্রভৃতি দেশ উপনিবেশ বিস্তারে অগ্রণী ভূমিকা নেয়। এই সব উপনিবেশ নিয়ে সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির মধ্যে প্রায় তিনশ বছর ধরে বিরোধ চলে। আঠারো শতকের শেষভাগে ইংলন্ড আমেরিকায় তার তেরোটি উপনিবেশ হারায়, ১৮১৫ সালে ফ্রান্স প্রাচ্যে ও আমেরিকায় তার প্রায় সব উপনিবেশ হারায়, স্পেন হারায় দক্ষিণ আমেরিকায় বিশাল সাম্রাজ্য। ১৮২২ সালে পর্তুগাল ব্রাজিল হারায়। এই সব ঘটনাকে ইউরোপীয় চিন্তাবিদরা অনেক ক্ষেত্রেই স্বাগত জানিয়েছিলেন। আপনারা ইতিমধ্যেই অ্যাডাম স্মিথ বা বেন্থামের মতামত জেনেছেন। আপনারা এও পড়েছেন যে উনিশ শতকের শেষ পর্বে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও অন্যান্য কারণে ইউরোপের শিল্পোন্নত দেশগুলির মধ্যে উপনিবেশ বিস্তারের এক বিশেষ তাড়না দেখা যায়।

ইতিহাসে এই সময়ের উপনিবেশ বিস্তারই উপনিবেশবাদ বা সাম্রাজ্যবাদ নামে চিহ্নিত হয়েছে। এই সময় প্রধানত দুটি মহাদেশে এশিয়া ও আফ্রিকায় উপনিবেশ স্থাপন নিয়ে তীব্র প্রতিযোগিতা শুরু হয়। নীচে এই দুই অঞ্চলে উপনিবেশ স্থাপনের সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হল।

১৮৭০ সালে ফ্রাঙ্কো-প্রাশিয়ার যুদ্ধে ফ্রান্স আলসেস লোরেন হারালে বিসমার্ক ফ্রান্সকে আলসেস লোরেন হারানোর ব্যথা ভুলানোর জন্য আফ্রিকায় উপনিবেশ স্থাপনে উৎসাহিত করেন। ফ্রান্স আলজিরিয়া দখল করে এবং বিসমার্কের প্ররোচনায় টিউনিসিয়ার দিকে এগিয়ে যায়। জনসংখ্যা বৃদ্ধির চাপ কমাতে এবং রাষ্ট্রীয় মর্যাদা বাড়াতে ইটালি ও আফ্রিকার উত্তর উপকূলে উপনিবেশ স্থাপন করতে চেয়েছিল। সিসিলি থেকে টিউনিসিয়ার দূরত্ব ১০০ মাইলেরও কম। টিউনিসিয়ায় ফ্রান্সের উপনিবেশে সম্প্রসারিত হলে ফ্রান্স ও ইটালির মধ্যে বিরোধ বাধে।

বেলজিয়ামের রাজা দ্বিতীয় লিওপোল্ড ১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দে আফ্রিকার অভ্যন্তর অন্বেষণের জন্য একটি সমিতি গঠন করেন (International African Association) এবং স্ট্যানলিকে (H.M.Stanley) কঙ্গো অঞ্চল অনুসন্ধানের জন্য পাঠান। কয়েক বছর অভিযান চালিয়ে স্ট্যানলী কঙ্গোর স্থানীয় শাসকদের সঙ্গে চুক্তি করে ঐ অঞ্চলের বিরাট এলাকায় বেলজিয়ামের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করেন। পনের শতক থেকেই কঙ্গো নদীর মোহনার কাছে আঙ্গোলায় পর্তুগালের একটা উপনিবেশ ছিল। পর্তুগাল ইংলন্ডের সহায়তায় বেলজিয়ামের উপনিবেশ বিস্তারের বিরোধিতা করে। ফ্রান্স কঙ্গো নদীর উত্তরে ক্রান্তীয় অঞ্চলে উপনিবেশ বিস্তারে আগ্রহী ছিল। জার্মানি চাইছিল আর একটু উত্তরে ক্যামেরুনে উপনিবেশ গড়তে। এই অবস্থায় লিওপোল্ড কঙ্গো সমস্যার সমাধানের জন্য জার্মানি ও ফ্রান্সের সহায়তা প্রার্থনা করেন। বিসমার্ক ও জুলেফেরীর (ফ্রান্সের প্রধানমন্ত্রী) চেষ্টায় ১৮৮৪ খ্রিস্টাব্দে বার্লিনে ইউরোপের সবকটি প্রধান প্রধান দেশ এক আন্তর্জাতিক সমাবেশে মিলিত হয়। ১৮৮৫ সালে স্বাক্ষরিত বার্লিন চুক্তিতে লিওপোল্ডকে কঙ্গোয় সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী বলে ঘোষণা করা হয়। বার্লিন চুক্তি কেবল কঙ্গো সমস্যার সমাধানই নয়, ভবিষ্যতে আফ্রিকায় উপনিবেশ স্থাপনের জন্য কয়েকটি নীতি ঘোষণা করে। স্থির হয় ভবিষ্যতে ইউরোপের একটি রাষ্ট্র আফ্রিকার কোন অঞ্চল দখল করলে তা যথাযথভাবে অন্য রাষ্ট্রকে জানিয়ে দিতে হবে এবং সেই অঞ্চলটি তার প্রভাবাধীন এলাকা বলে স্বীকৃত হবে। বার্লিন সমাবেশে যে নীতি গৃহীত হয় তাতে আফ্রিকাকে শান্তিপূর্ণভাবে এবং পারস্পরিক বোঝাপড়ার মাধ্যমে সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলির মধ্যে বণ্টন করে নেওয়ার সুযোগ এনে দেয়।

১৮৮৫ সালের পরের দশকে সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলি আফ্রিকার অভ্যন্তর অনুসন্ধানের জন্য এবং সেখানকার সম্পদ আহরণের জন্য বেলজিয়ামের অনুকরণে চার্টার্ড কোম্পানি গঠন করে। কোম্পানিগুলি আফ্রিকায় উপনিবেশ বিস্তারে পথিকৃৎ ছিল। জার্মানি দ্রুত টোগোল্যান্ড, ক্যামেরুন, জার্মান দক্ষিণ আফ্রিকা ও জার্মান পূর্ব আফ্রিকা দখল করে দৃঢ়ভাবে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে। ফ্রান্স ইতিপূর্বেই আলজিরিয়া ও টিউনিসিয়ায় উপনিবেশ স্থাপন করেছিল। এখন ডাহোমি দখল করে এবং আলজিরিয়া থেকে অগ্রসর হয়ে সেনেগাল, গিনি, আইভরিকোস্ট প্রভৃতি স্থান দখল করে পশ্চিম আফ্রিকায় এক বিরাট অখণ্ড সাম্রাজ্য গঠন করতে সক্ষম হয়। তাছাড়া কঙ্গোর উত্তরদিকে ফ্রান্স ফরাসী ক্রান্তীয় আফ্রিকা নামে উপনিবেশ স্থাপন করে। ১৮৮৬ সালে পূর্ব উপকূলে মাদাগাস্কার তার অধিকারে আসে এবং সোমালিল্যান্ডের এক অংশেও তার দাবি প্রতিষ্ঠিত হয়।

১৮১৫ সালে ভিয়েনা চুক্তিতে ব্রিটেন হল্যান্ডের কাছ থেকে আফ্রিকার কেপ অঞ্চল অধিকার করেছিল। এখন কেপ থেকে ধীরে ধীরে উত্তরের দিকে এগিয়ে গিয়ে বেচুয়ানাল্যান্ড (১৮৮৫), রোডিসিয়া (১৮৮৯) এবং

নিয়াসাল্যান্ড-এ (১৮৯৩) উপনিবেশ স্থাপন করে। এই ভাবে ভবিষ্যতে জার্মান পশ্চিম আফ্রিকা ও জার্মান পূর্ব-আফ্রিকার মিলনে বাধা সৃষ্টি করে। কেপ থেকে সিসিল রোডসের ব্যক্তিগত চেষ্টায় ব্রিটেনের এই প্রসার সম্ভব হয়েছিল। দক্ষিণ আফ্রিকায় তখন ওলন্দাজ (ডাচ) উপনিবেশকারীদের বংশধর 'বুয়ার্ন'রা অরেঞ্জ ফ্রি স্টেট এবং ট্রান্সভ্যাল এ দুটি স্বাধীন রাজ্য গড়ে তুলেছিল। ১৮৯৯ সালের বুয়ার্স যুদ্ধে ব্রিটেন বুয়ার্সদের হারিয়ে দিয়ে এই রাজ্য দুটি দখল করে। এছাড়া ব্রিটেন পশ্চিম উপকূলে নাইজেরিয়া এবং ব্রিটিশ পূর্ব আফ্রিকা ও উগাণ্ডা নামে দুটি উপনিবেশ স্থাপন করেছিল।

ইটালির উপনিবেশ স্থাপনের আকাঙ্ক্ষার কথা আপনারা আগেই জেনেছেন। টিউনিসিয়া দখল করে নিয়ে ফ্রান্স ইটালির আফ্রিকায় উপনিবেশ স্থাপনে বাধা সৃষ্টি করেছিল। এখন ইটালি ইরিট্রিয়া দখল করে এবং এর সঙ্গে আনমারা যুক্ত করে ইটালীও পূর্ব আফ্রিকা নামে এক বিশাল উপনিবেশ স্থাপন করে। তাছাড়া পূর্ব উপকূলে সোমালিল্যান্ডের এক অংশ তার দখলে এসেছিল। স্বাধীন আবিসিনিয়ার ওপরও ইটালি রাজনৈতিক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেছিল। ১৮৯৬ সালে আবিসিনিয়া ইটালিকে পরাজিত করলে ইটালি এই কর্তৃত্ব ত্যাগ করে।

১৮৭৫ সালে আফ্রিকার এক দশমাংশ অঞ্চলে ইউরোপীয় দেশগুলি উপনিবেশ স্থাপন করেছিল। দুই দশক পরে ১৮৯৫ সালে আফ্রিকার কেবল এক দশমাংশ উপনিবেশ এলাকার বাইরে থাকে। আফ্রিকার বণ্টন এত দ্রুত সম্পন্ন হয়েছিল যে উনিশ শতকের শেষে আফ্রিকায় মাত্র দুটি দেশ—আবিসিনিয়া ও লাইবেরিয়া স্বাধীনতা বজায় রাখতে পেরেছিল। আর তিনটি দেশ মরক্কো, লিবিয়া ও মিশর সাম্রাজ্যবাদীদের প্রতিদ্বন্দ্বিতার শিকার হয়ে কোনভাবে নিজেদের রাজনৈতিক অস্তিত্ব রক্ষা করে চলছিল।

চীনে উপনিবেশ বিস্তারের ইতিহাস আপনারা Paper IV, Moldule XIII-XVI এ পড়েছেন। এখানে সেই কাহিনীই সংক্ষেপে পুনারাবৃত্তি করা হল।

ইউরোপের সঙ্গে চীনের বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপিত হয় ষোল শতকে। চীন পর্তুগীজ বণিকদের ম্যাকাও দ্বীপে বাণিজ্য করার অনুমতি দেয়। কিন্তু চীনের মাঞ্চুরাজারা বিদেশের সঙ্গে বাণিজ্য একেবারে পছন্দ করতেন না। তাঁরা বলতেন বিশাল চীনদেশে পাওয়া যায় না এমন কিছুই নেই। চীনাদের বাইরের কোন দ্রব্যের প্রয়োজন নেই। মাঞ্চুরাজারা বৈদেশিক বাণিজ্যের পথে নানা প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করতেন। বিদেশের বাজারে চীনের সিল্ক, চা, কাগজ, তামা, পারদ ইত্যাদি দ্রব্যের বিরাট কদর ছিল। আঠারো শতক থেকে চীনা সরকার ইউরোপীয়দের কান্টন শহরে সীমিত বাণিজ্যের অধিকার দিয়েছিল। কিন্তু এই বাণিজ্য চীনা বণিকদের সঙ্গে স্থলপথে হত। শুল্ক ফাঁকি দেবে ভয়ে জলপথে নয়। চীনা রাজকর্মচারীরাও সরাসরি যুক্ত হতে পারতেন না। সম্রাটের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হলে বিদেশীদের চৈনিক কায়দায় হাঁটু গেড়ে, মাটিতে কপাল স্পর্শ করে আবেদন জানাতে হত।

চীনের বিশালায়তন বাজারের দিকে শিল্প বিপ্লবোত্তর ইংলন্ডের স্বভাবতই লোলুপ দৃষ্টি পড়ে। বাণিজ্যিক পুঁজিপতি ও শিল্প পুঁজিপতি উভয় ধরনের লোকের কাছেই চীনের রপ্তানী দ্রব্যের চাহিদা ছিল। কিন্তু চীনের কাছে বিদেশী দ্রব্যের কদর না থাকায় বিদেশী বণিকদের চীনা দ্রব্যের সোনা-রূপো দিয়ে দাম মেটাতে হত। ইংল্যান্ডের পক্ষে এত সোনা রূপো পাঠানো সম্ভব ছিল না। তাই ইংলন্ড ভারতে আফিম উৎপন্ন করে গোপনে চীনের বাজারে বিক্রী শুরু করে। ধীরে ধীরে চীনারা আফিম খেতে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে এবং প্রচুর আফিম চোরা পথে চীনে প্রবেশ করে। এবারে বিনিময়ে চীন থেকে প্রচুর রূপো ক্রমাগত বিদেশে চলে যেতে থাকে। চীনের আর্থিক সঙ্কট দেখা দেয়। চীনা সম্রাট রাজকর্মচারী লিনকে বে-আইনি ব্যবসা বন্ধ করার জন্য কান্টনে পাঠান

(১৮৩৯)। লিন বন্দরের জাহাজের সব আফিম ধ্বংস করে ইংলন্ডের সঙ্গে বাণিজ্য বন্ধ করে দেন ও ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানির সব কর্মচারিকে চীন থেকে তাড়িয়ে দেন। এই সময় ইংলন্ডের সরকার তাদের দেশের ব্যবসায়ীদের স্বার্থ দেখতে এগিয়ে আসে এবং চীনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। ইতিহাসে এই যুদ্ধ প্রথম আফিম যুদ্ধ নামে পরিচিত। যুদ্ধে চীন পরাজিত হলে নানকিং-এর সন্ধি (১৮৪২) স্বাক্ষরিত হয়। সন্ধির শর্ত অনুসারে চীন ইংরেজদের পাঁচটি বন্দরে ব্যবসা করার অধিকার দেয় এবং হংকং ইংরেজদের হাতে তুলে দেয়। উপরন্তু মোটা অঙ্গের আর্থিক ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য হয়। ইংরেজদের দেখাদেখি ফ্রান্স ও আমেরিকা বাণিজ্যের সুবিধা দাবী করে। চীন ভয় পেয়ে নতুন করে বিরোধ এড়াতে ফ্রান্স ও আমেরিকাকে ইংলন্ডের অনুরূপ বাণিজ্যিক সুবিধা দেয়। চুক্তিতে বলা হয়েছিল শুল্কের হার পাঁচ শতাংশ হারে হবে এবং ভবিষ্যতে বাড়ানো যাবে না। চুক্তিগুলি অসম চুক্তি (unequal treaties) নামে পরিচিত। কেননা বিদেশীরা বাণিজ্য ছাড়াও অনেক বাড়তি সুবিধা পেয়েছিল। চীনের মাটিতে অপরাধ করলে বিদেশীদের চীনের আইন অনুসারে বা চীনের আদালতে বিচার হবে না। বিচার হবে অপরাধকারীর দেশের আইন অনুসারে। এগুলি অতিরাষ্ট্রিক অধিকার (extra-territorial rights)। চীনের সার্বভৌম ক্ষমতা খর্বিত হল। আফিম ব্যবসা বেআইনি ঘোষিত হলেও আফিম পাচার বন্ধ হয় নি। শুল্কহার নির্দিষ্ট হওয়ায় চীনের বাজার বিদেশী শিল্পপণ্যে ছেয়ে গেল। চীনের কুটির শিল্প ধীরে ধীরে লোপ পেতে থাকল এবং চীন আধা উপনিবেশে পরিণত হতে চলল।

চীনে আফিম আমদানি বে-আইনি ঘোষিত হলেও অস্ত্র সজ্জিত জাহাজে আফিম আমদানি হতেই থাকে। চীন ইংলন্ড ও ফ্রান্সের বাণিজ্যতরীকে বিশেষ নদীপথ ব্যবহার করতে বাধ্য করতে চাইলে দ্বিতীয় আফিম যুদ্ধ শুরু হয় (১৮৫৮)। এক ফরাসী ক্যাথলিক পাদরী চীন বিরোধী কাজ করলে তাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়। ফ্রান্স এর প্রতিবাদ করে এবং ইংলন্ডের সঙ্গে মিলিত হয়ে যুদ্ধ করে। তিয়েনমিনের সন্ধিতে (১৮৬০) যুদ্ধ শেষ হলে চীন বিদেশীদের আরও এগারোটি বন্দর বাণিজ্যের জন্য উন্মুক্ত করে, আমদানি করা বিদেশী দ্রব্যের ওপর শতকরা আড়াই ($২\frac{৩}{৩}\%$) ভাগের বেশি শুল্ক বসাবে না প্রতিশ্রুতি দেয় এবং বিদেশীরা চীনে অবাধ চলাফেরার অধিকার পায়। তাছাড়া চীনের ওপর ক্ষতিপূরণের বিরাট বোঝা চাপিয়ে দেওয়া হয়।

মাঞ্চুরাজারা বুঝতে পেরেছিল রাজতন্ত্রকে টিকিয়ে রাখতে হলে সেনাবাহিনীর আধুনিকীকরণ এবং পশ্চিমী শিক্ষা ও প্রযুক্তি কৌশল আয়ত্তের প্রয়োজন আছে। তারা প্রশাসনিক সংস্কারে হাত দিল এবং পশ্চিমী শিক্ষার বিস্তার এবং আধুনিক শিল্প স্থাপন শুরু করল। অবশ্য অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিদেশীরাই শিল্পে পুঁজি বিনিয়োগ করে। পুঁজিবাদী দেশগুলো বুঝতে পেরেছিল যে চীনের মত বিরাট দেশে প্রত্যক্ষ উপনিবেশ স্থাপনের চেয়ে দুর্বল রাজতন্ত্রকে টিকিয়ে রাখাই বেশি লাভজনক। ইংলন্ড, ফ্রান্সের পর রাশিয়া জার্মানি জাপান চীনে নিজেদের একচেটিয়া আধিপত্যের এলাকা (sphere of influence) দখল করল। এইভাবে উনিশ শতকের শেষ দশকগুলিতে চীনা তরমুজ ভাগ করে নেওয়ার সময় এল। চীন পুঁজিবাদী দেশের পরোক্ষ উপনিবেশে পরিণত হল।

রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক উভয় কারণেই রাশিয়া সাম্রাজ্য বিস্তারের পথ বেছে নেয়। বহির্বিশ্বে পৌঁছানোর জন্য রাশিয়ার চিরাচরিত নীতি ছিল দুর্বল তুরস্ক সাম্রাজ্যের কৃষ্ণা সাগর তীরবর্তী রাজ্যগ্রাস করা। কিন্তু এই নীতি বাধাপ্রাপ্ত হয় ক্রিমিয়ার যুদ্ধে পরাজয়ে (১৮৫৬)। এরপর থেকে রাশিয়া মধ্য এশিয়া ও দূরপ্রাচ্যে রাজ্য বিস্তারে মন দেয়।

মধ্য এশিয়ায় তুর্কিস্তান নামেমাত্র চীন সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। তুর্কিস্তান থেকে যাযাবর দস্যুরা প্রায়ই রাশিয়ার সীমান্তবর্তী প্রদেশে লুটপাট করতে আসত। এদের শায়েস্তা করার জন্য রাশিয়া ১৮৬৪ সালে তাসখন্দ দখল করে। এর অল্প কিছুদিনের মধ্যেই সমরখন্দ ও খিভা দখল করে। এইভাবে সমস্ত তুর্কিস্তান রাশিয়ার অধিকারে চলে আসে (১৮৭৩)। মধ্য এশিয়ায় রাশিয়ার সাম্রাজ্য পারস্য ও আফগানিস্তানের সীমান্তে পৌঁছে যায়। ফলে ইংলন্ড ভারতের নিরাপত্তা নিয়ে চিন্তিত হয়ে পড়ে।

আফিম যুদ্ধের পর পশ্চিমী দেশগুলি যখন পূর্ব দিক থেকে চীনের অভ্যন্তরে প্রবেশ করছিল তখন রাশিয়া উত্তর ও দক্ষিণ দিক থেকে চীনকে গ্রাস করতে এগিয়ে যায়। আমুর নদী বরাবর অগ্রসর হয়ে ১৮৬০ সালে রাশিয়া জাপান সাগর উপকূলে ভ্লাডিভস্টক দখল করে। নয়ের দশকে ট্রান্সসাইবেরিয়ান রেলপথের নির্মাণ সম্পূর্ণ হলে ঐ রেলপথ ভ্লাডিভস্টক পর্যন্ত সম্প্রসারিত করা হয়। ভ্লাডিভস্টক দূর প্রাচ্যে রাশিয়ার গুরুত্বপূর্ণ বন্দরে পরিণত হয়।

চীন-জাপান যুদ্ধে (১৮৯৪-৯৫) চীনকে পরাজিত করে জাপান একতরফাভাবে চীনের রাজ্য গ্রাস করতে থাকলে রাশিয়া ও ইংলন্ড যৌথভাবে প্রতিবাদ জানায় এবং রাশিয়া জাপানকে বঞ্চিত করে লিয়াওটাঙ উপদ্বীপ দখল করে। এখানকার বন্দর পেটি আর্থার নৌ-ঘাঁটি হিসাবে গড়ে উঠে। লিয়াওটাঙ ছিনিয়ে নেওয়ায় এবং কোরিয়ায় রাশিয়ার প্রভাব ক্রমশ বৃদ্ধি পাওয়ায় শঙ্কিত হয়ে জাপান রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। রুশ-জাপান যুদ্ধে (১৯০৫) রাশিয়া পরাজিত হয় এবং লিয়াওটাঙ উপদ্বীপ জাপানকে ফিরিয়ে দিতে বাধ্য হয়। রাশিয়ার এশিয়ায় সাম্রাজ্য বিস্তার এখানেই থেমে যায়। এশিয়ার বাইরে রাশিয়ার সাম্রাজ্য ছিল না। এশিয়ায় অধিকৃত অঞ্চলের প্রাকৃতিক সম্পদ ও বাজার রাশিয়ার শিল্প বিকাশের সহায়ক হয়েছিল।

৩.৮ সারাংশ

উনিশ শতকের শেষে পশ্চিমের শিল্পোন্নত পুঁজিবাদী দেশ কর্তৃক আফ্রিকা, এশিয়া ও ল্যাটিন আমেরিকায় প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ উপনিবেশ বিস্তার এক বিশ্ব ধনতান্ত্রিক অর্থ ব্যবস্থা গড়ে তোলে। এই ব্যবস্থায় উপনিবেশের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবর্তন ঔপনিবেশিক দেশের অর্থনৈতিক সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবর্তনের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। উপনিবেশ বিস্তার অনেকক্ষেত্রে শান্তিপূর্ণভাবে বোঝাপড়ার মধ্য দিয়ে হলেও শেষ পর্যন্ত শিল্পোন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলির মধ্যে সংঘাত সৃষ্টি করে এবং বিশ্বযুদ্ধের সূচনা করে।

৩.৯ অনুশীলনী

১। উপনিবেশবাদ-এর বৈশিষ্ট্য আলোচনা করুন।

২। উপনিবেশ বিস্তারের পর্যায়গুলি বিশ্লেষণ করুন।

৩। ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলি কিভাবে আফ্রিকাকে ভাগ বাঁটোয়ারা করে নিয়েছিল?

৪। ল্যাটিন আমেরিকার উপনিবেশবাদ অন্যান্য উপনিবেশবাদ থেকে কি অর্থে পৃথক?

৫। রাশিয়ার উপনিবেশ বিস্তারের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস আলোচনা করুন।

৬। সাম্রাজ্যবাদ প্রসঙ্গে লেলিনের তত্ত্ব ব্যাখ্যা করুন।

৩.১০ গ্রন্থপঞ্জী

১। David Thomson—Europe since Nepoleon (1965).

২। V. I. Lenin—Imperialism, The Highest Stage of Capitalism (1916-ne wed. 1936)

৩। R. Palme Dutt—India Today (1970).

৪। সমরকুমার মল্লিক—নবরূপে ইউরোপ, ১৮৪৮-১৯১৯ (২০০২)।

৫। প্রফুল্ল চক্রবর্তী—ইউরোপের ইতিহাস (১৯৮৩)।

একক ৪(ক) ❑ বলকান জাতীয়তাবাদ

গঠন

৪(ক).০ উদ্দেশ্য

৪(ক).১ প্রস্তাবনা

৪(ক).২ বলকান জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের প্রেক্ষাপট

৪(ক).৩ বলকান জাতি-রাষ্ট্র গঠনের পর্যায়

(ক) সাবিয়ার অভ্যুত্থান

(খ) গ্রীসের স্বাধীনতা সংগ্রাম

(গ) ক্রিমিয়ার যুদ্ধ ও যুদ্ধ পরবর্তী অধ্যায়

(ঘ) রুশ-তুরস্ক যুদ্ধ ও বার্লিন চুক্তির পরবর্তী অধ্যায়

(ঙ) বলকান যুদ্ধের পটভূমিকা

(চ) প্রথম বলকান যুদ্ধ

(ছ) দ্বিতীয় বলকান যুদ্ধ

৪(ক).৪ বলকান জাতীয় জাগরণ ও জাতি-রাষ্ট্র গঠন

(ক) সার্বিয়া

(খ) গ্রীস

(গ) রুমানিয়া

(ঘ) বুলগেরিয়া

৪(ক).৫ সারাংশ

৪(ক).৬ অনুশীলনী

৪(ক).৭ গ্রন্থপঞ্জী

৪(ক).০ উদ্দেশ্য

বলকান উপদ্বীপ (Balkan Peninsula) — দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার একটি শিলাময় অঞ্চল। উত্তরে সাভা (Sava) ও ড্যানিউব (Danube) নদী থেকে দক্ষিণে ভূমধ্যসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত। বলকান নামটি এসেছে বলকান পাহাড়ের নাম থেকে। এটি বড় পাহাড় নয়, শিলাশ্রেণী মাত্র। উত্তরে ড্যানিউব থেকে শুরু হয়ে পূর্বদিকে বুলগেরিয়া অঞ্চল ঘুরে চলে গেছে ভূমধ্যসাগর পর্যন্ত। এই শিলাশ্রেণীর সর্বোচ্চ শিখর হল ইউম্‌রুকচল (Yumrukchal — ৭,৭৮৬ ফুট)। এই উপদ্বীপকে কখনো কখনো ঈলিরিয়ান উপদ্বীপ (Illyrian Pennisula)

বলা হয়। এর পূর্বদিকে আছে কৃষ্ণসাগর, মারমারা (Marmara Sea) সাগর এবং ইজিয়ান সাগর (Aegian Sea)। এর পশ্চিমে আছে অড্রিয়াটিক সাগর (Adriatic) ও আইওনীয় সাগর। এর আয়তন ২,০০,০০০ বর্গমাইল। এর জনসংখ্যা ৩২,০০০,০০০। প্রাচীনকালে এই অঞ্চল রোমান সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগে ৪০০ বছর এই অঞ্চল তুর্কী সাম্রাজ্যের অংশ ছিল।

৪(ক).১ প্রস্তাবনা

দক্ষিণ পূর্ব ইউরোপের যে অংশটি ভূমধ্যসাগরে প্রবেশ করে উপদ্বীপ সৃষ্টি করেছে ঐ অঞ্চলকে বলকান উপদ্বীপ বলে। (ম্যাপ দেখুন) উনিশ শতকের শুরুতে বলকান উপদ্বীপের অধিকাংশ দেশ যথা— গ্রীস, সার্বিয়া, হারজেগোভিনা, আলবেনিয়া, বুলগেরিয়া, রুমেনিয়া, তুরস্ক বা অটোমান সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। সতেরো শতকে হাঙ্গেরীর বুডাপেষ্ট থেকে শুরু করে সমগ্র বলকান উপদ্বীপ, আনাটোলিয়া (আধুনিক তুরস্ক), ককেশাস অঞ্চল, আর্মেনিয়া, সিরিয়া, আরবদেশ এবং উত্তর আফ্রিকায় মরোক্কো, টিউনিসিয়া, লিবিয়া ও মিশর পর্যন্ত তুরস্ক সাম্রাজ্য বিস্তৃত ছিল। সতেরো শতকের শেষ বছর থেকেই (১৬৯৯) তুরস্ক সাম্রাজ্য সঙ্কুচিত হতে থাকে। অস্ট্রিয়ার হ্যাপসবুর্গ সম্রাটরা হাঙ্গেরীর বুডাপেষ্ট, ট্রানসিলভ্যানিয়া প্রভৃতি স্থান পুনর্দখল করে। পরের শতকে রাশিয়া রুমানিয়ার বেসারাবিয়া কৃষ্ণসাগরের পশ্চিম উপকূলের কিছু অংশ এবং ককেশাস ও আর্মেনিয়ার অংশ বিশেষ দখল করে। মিশর স্বায়ত্তশাসনের অধিকার পায়। মরোক্কো, টিউনিসিয়া, লিবিয়া করদ রাজ্যের (tributary state) মর্যাদা পেলেও নিজেদের স্বাধীন মনে করে। অটোমান সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হলেও দুর্ধর্ষ পার্বত্যজাতি অধ্যুষিত আলবেনিয়া থেকে সুলতানরা কখনো কর আদায় করতে পারেনি। তুরস্ক কর্তৃক শাসনকর্তা নিযুক্ত হলেও আলবেনিয়া প্রায় স্বাধীন ছিল।

ফরাসী বিপ্লবের পরোক্ষ ফল এবং নেপোলিয়নের শাসনসংস্কারের অবশ্যম্ভাবী ফল হিসাবে উনিশ শতকে ইউরোপে জাতিরাষ্ট্র গঠনের প্রবণতা দেখা দেয়। জাতিরাষ্ট্র বলতে বোঝাত পৃথক পৃথক ভাষা ও জাতির ভিত্তিতে (ethnicity) পৃথক রাষ্ট্রগঠন। জাতিরাষ্ট্র গঠনের আন্দোলন উনিশ শতকের দ্বিতীয় অর্ধে প্রবল আকার ধারণ করে এবং ১৮৭০ সালে জার্মানি ও ইটালির ঐক্যবদ্ধ জাতি-রাষ্ট্র গঠন সম্পূর্ণ হয়। বলকান অঞ্চলের দেশগুলিতেও জাতিরাষ্ট্র গঠনের ঢেউ পৌঁছায়। এই পটভূমিতেই বলকান জাতীয়তাবাদের সূত্রপাত।

অবশ্য বলকান জাতীয়তাবাদের একটি অন্যদিকও ছিল। দীর্ঘদিন তুর্কীশাসনে থেকে বলকান অঞ্চলের খ্রীস্টান মানুষরা একটা বৈষম্যের মধ্যে দিন কাটাচ্ছিল। অটোমান সাম্রাজ্যে মুসলমান প্রজারা যে সুযোগ সুবিধা পেত তা খ্রিস্টান প্রজারা অনেক সময়েই পেত না। তাছাড়া সেখানকার অমুসলমান প্রজারা কোথাও কোথাও মুসলমান প্রজাদের থেকে অনেক বেশি কর প্রদান করত। ফলে তারা দীর্ঘদিন ধরে নিজেদের খ্রিস্টান ধর্ম ও পৃথক ঐতিহ্যের ভিত্তিতে মূলতঃ স্ল্যাভ জাতিসত্তার উপকরণগুলিকে নিয়ে পৃথক পৃথক জাতীয় অস্তিত্ব গড়ে তুলতে চাইছিল। মনে রাখতে হবে যে ফরাসী বিপ্লব ও নেপোলীয়নের শাসনসংস্কার যেভাবে জার্মানি ও ইটালির ঐক্যবদ্ধ হওয়ার ঘটনাকে প্রেরণা জুগিয়েছিল সেভাবে বলকান রাষ্ট্রগুলিকে করেনি। সেখানে তাদের জাতীয়তাবাদের উৎস ছিল নিজেদের স্ল্যাভ ঐতিহ্য ও বিশিষ্টতা। অটোমান সাম্রাজ্য যতই দুর্বল হয়েছে ততই তারা সেই সাম্রাজ্য থেকে পৃথক হয়ে স্বতন্ত্র অস্তিত্ব গড়ে তোলার দিকে মন দিয়েছে।

৪(ক).২ বলকান জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের প্রেক্ষাপট

আয়তনে বিশাল হলেও উনিশ শতকে অটোমান সাম্রাজ্য রাজনৈতিক দিক থেকে ছিল খুবই দুর্বল। সুলতানরা ছিলেন অপদার্থ, দুর্নীতিগ্রস্ত ও সংস্কার বিমুখ। ইসলামীয় ধর্মীয় নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত (theocratic) অটোমান সাম্রাজ্যে নানা জাতি, ভাষা ও ধর্মীয় গোষ্ঠীর মানুষের বাস। বিভিন্ন ভাষাভাষি ও ধর্মীয় অধিবাসীদের মধ্যে মোটেই ঐক্য ছিল না। শাসকশ্রেণী মুসলমান। প্রাদেশিক শাসনকর্তারা (পাশা) কেন্দ্রের নির্দেশ না মেনে প্রায় স্বাধীনভাবে তুরস্কের বাছাই করা সৈন্যদের দ্বারা গঠিত জানিসারি (Janissery) দের সাহায্যে স্বৈরাচারী শাসন প্রতিষ্ঠিত করেছিল। তুরস্কের সেনাবাহিনীতে না ছিল শৃঙ্খলা, না ছিল আধুনিক অস্ত্রের যোগান।

তুরস্কের দুর্বলতার সুযোগে ইউরোপের বৃহৎ রাষ্ট্রগুলি নিজ নিজ স্বার্থসিদ্ধি করার চেষ্টা করে যায়। রাশিয়ায় কোন বন্দরই সারা বছর বরফমুক্ত ছিল না। রাশিয়া চাইছিল কৃষ্ণসাগরের পশ্চিম উপকূল দখল করে নিয়ে বসফরাস ও ডার্ডানেলস প্রণালীর মধ্য দিয়ে ভূমধ্যসাগরে প্রবেশ করতে। বলকান উপদ্বীপের অধিকাংশ লোক ছিল স্ল্যাভ জাতি গোষ্ঠীভুক্ত ও গোঁড়া খ্রিস্টান (Orthodox Christian or Greek Christian) ধর্মাবলম্বী। রাশিয়ানরাও ছিল স্ল্যাভ জাতিভুক্ত ও গোঁড়া খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বী। উনিশ শতকে রাশিয়া বলকান অঞ্চলে স্লাভ জাতীয়তাবাদের (Pan-slavism) পৃষ্ঠপোষকতা করে। উদ্দেশ্য ছিল নিজের প্রভাব বৃদ্ধি করা এবং তাঁবেদার রাষ্ট্র গঠন করে ঐসব দেশের মধ্য দিয়ে ভূমধ্যসাগরের তীরে পৌঁছানো।

হ্যাপসবুর্গ সাম্রাজ্যে নানা জাতি, ধর্ম ও ভাষাভাষি লোকের বাস। বলকান অঞ্চলে জাতিরাষ্ট্র গঠিত হলে হ্যাপসবুর্গ সাম্রাজ্যেও জাতিরাষ্ট্র গঠনের দাবি প্রতিরোধ করা সম্ভব ছিল না। তাই অস্ট্রিয়ার নীতি ছিল অটোমান সাম্রাজ্য অটুট রাখা, অবশ্য সুযোগ পেলে বসনিয়া, হারজেগোভিনা প্রভৃতি রাজ্যগুলি দখল করে নেওয়া, যাতে ভবিষ্যতে ঐক্যবদ্ধ সার্বরাষ্ট্র গঠিত হতে না পারে।

মিশর, সিরিয়া ও অন্যান্য আরব রাষ্ট্রের সঙ্গে ইংলন্ড ও ফ্রান্স বাণিজ্য সম্পর্ক স্থাপন করেছিল। ইংলন্ড ও ফ্রান্স উভয়েরই নীতি ছিল ভবিষ্যতে আরব অঞ্চল গ্রাস করা। তা সত্ত্বেও উভয় দেশই অটোমান সাম্রাজ্যের অখণ্ডতা বজায় রাখতে চাইত। ঐ অঞ্চলে রাশিয়ার প্রভাব বৃদ্ধি ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের নিরাপত্তা ক্ষুণ্ণ করতে পারে। ১৮৬৯ সালে আন্তর্জাতিক নৌ-চলাচলের জন্য সুয়েজ খাল খুলে দিলে ইংলন্ডের আশঙ্কা বৃদ্ধি পায়। অবশ্য ফ্রান্স ও ইংলন্ড বলকান জাতীয়তাবাদী আন্দোলন সম্পর্কে সম্পূর্ণরূপে নির্লিপ্ত থাকতে পারে নি।

উনিশ শতকের প্রথম পর্বে প্রাশিয়া তুরস্কের ঘটনাবলী সম্পর্কে উদাসীন ছিল। কিন্তু ঐক্যবদ্ধ হওয়ার পর এবং জার্মানির দ্রুত শিল্পবিকাশ হলে, বিশেষভাবে ১৮৭৮ সালে বার্লিন চুক্তির পর, অস্ট্রিয়ার মিত্র হিসাবে জার্মানি তুরস্ক সম্পর্কিত প্রশ্নে জড়িয়ে পড়ে। জার্মানির বাড়তি জনসংখ্যার বসবাস ও উদ্বৃত্ত পুঁজি বিনিয়াগের পক্ষে তুরস্ক সাম্রাজ্য ছিল প্রকৃষ্ট ক্ষেত্র। ১৯০৮ সালে জার্মানির সম্রাট কাইজার দ্বিতীয় উইলিয়ম কনস্টানটিনপল ভ্রমণ করেন ও তুরস্কের সুলতানকে জার্মানির মিত্র হিসাবে ঘোষণা করেন।

বাড়তি জনসংখ্যার বসাবাসের জন্য এবং পুঁজি বিনিয়োগের জন্য উনিশ শতকের অন্তিম লগ্নে ইতালি ও তুরস্কের রাজ্যগ্রাসের আকাঙ্ক্ষা পোষণ করতে থাকে।

রাশিয়া মনে করত তুরস্ক দুর্বল, তার শাসক হলেন ইউরোপের রোগগ্রস্ত মানুষ (Sickman of Europe)। যে কোন সময়ে এই সাম্রাজ্যের পতন অনিবার্য। ইউরোপের বৃহৎ রাষ্ট্রগুলির উচিত তুরস্কের পতনের

আগেই এর ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করা। তুরস্কের বিশেষ বিশেষ রাজ্যের প্রতি লোভ থাকলেও রাশিযা ছাড়া অন্য বৃহৎ রাষ্ট্র কেউই তুরস্কের সম্পূর্ণ অবলুপ্তি চাইত না। তুরস্ক সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে এতই রেষারেষি ও বৈষম্য যে পশ্চিম ইউরোপের বৃহৎ রাষ্ট্রগুলি মনে করত সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের চেয়ে দুর্বল কেন্দ্রীয় সরকারের ওপর প্রভাব বিস্তার অধিকতর সহজ। তারা বলকান জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে ইন্ধন যোগাত, কিন্তু কেউ চাইত না তুরস্ক সাম্রাজ্য একেবারে ভেঙে পড়ুক। এই বৃহত্তর পটভূমি মনে রেখেই বলকান জাতীয়তাবাদের ইতিহাস পড়তে হবে।

বলকান জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে কয়েকটি পর্যায়ে ভাগ করা যায়। আমরা পর্যায়গুলি জেনে নিয়ে পৃথক জাতিরাষ্ট্র গঠনের ইতিহাস পরে আলোচনা করব।

৪(ক).৩ বলকান জাতি-রাষ্ট্র গঠনের পর্যায়

(ক) প্রথম পর্যায় : সার্বিয়ার বিদ্রোহ, ১৮০৪

বলকান জাতিগুলির মধ্যে সার্বিয়াই প্রথম তুরস্কের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। তুরস্কের ক্রমবর্ধমান দুর্বলতা এবং রাশিয়ার আগ্রাসী নীতিতে উৎসাহিত হয়ে সার্বিয়া ১৮০৪ সালে তুরস্কের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়। কারাজর্জ নামে স্থানীয় এক মেষপালক এই বিদ্রোহের নেতৃত্ব দেন। তুর্কী সৈন্য, জানিসারি (Janissery), বিদ্রোহ দমন করতে ব্যর্থ হয়। সার্বিয়ানরা সব তুর্কীদের দেশ থেকে তাড়িয়ে দেয়। ১৮১৩ সালে তুরস্ক সার্বিয়া পুনর্দখল করে। কারাজর্জ হাঙ্গেরীতে পালিয়ে যান। ১৮১৫ সালে আর এক সার্বিয়ান নেতা **মিলোস** ও **ব্রোনোভিক** কারাজর্জের হত্যা ঘটিয়ে নিজে সার্বিয়ানদের নেতা হন এবং আবার তুরস্কের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। রাশিয়ার চাপে পড়ে তুরস্কের সুলতান সার্বিয়ানের স্বায়ত্তশাসনের অধিকার দেয়, ওব্রোনোভিককে শাসন কর্তা বা পাশারূপে ঘোষণা করে। বেলগ্রেডে রাজধানী স্থাপিত হয়। সার্বিয়াই প্রথম বলকান রাজ্য যে তুরস্কের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা ঘোষণা করে এবং আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার পায়।

(খ) দ্বিতীয় পর্যায় : গ্রীসের স্বাধীনতা সংগ্রাম

বলকান জাতীয়তাবাদ আন্দোলনের দ্বিতীয় পর্যায় শুরু হয় ১৮২১ সালে গ্রীসের স্বাধীনতা সংগ্রামের সূচনা থেকে।

তুরস্কের শাসনাধীন থাকলেও গ্রীকগণ নানাপ্রকার সুযোগ সুবিধা ভোগ করত। গ্রীসের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে তুরস্ক অযথা হস্তক্ষেপ করত না। গ্রীকরা দাবী করত তারা প্রাচীন গ্রীকজাতির বংশধর। নিজেদের ধর্ম (গ্রীক খ্রিস্টান বা গোঁড়া খ্রিস্টান) ভাষা ও ঐতিহ্য নিয়ে গ্রীকদের গর্ব ছিল। উনিশ শতকে গ্রীক স্বাধীনতা আন্দোলনের সূত্রপাত হয় গ্রীক ভাষার পুনর্জাগরণের মধ্য দিয়ে। ভাষা আন্দোলনে দুজন গ্রীক কবি ও সাহিত্যিক অগ্রণী ভূমিকা নেন। তাঁরা হলেন **আডামানটিওস কোরেস** (Adamantios Koraes) ও **রীগাস ফেরাইওস** (Rhigas Pheraiios) তাঁরা উভয়েই ফরাসী বিপ্লবের ভাবধারায় গভীরভাবে অনুপ্রাণিত হন। ইটালি বা স্পেনের ধাঁচে রাজনৈতিক আন্দোলন করার জন্য অনেক গুপ্ত সমিতি স্থাপন করেন।

গ্রীসের স্বাধীনতা আন্দোলন শুরু করে "হেটাইরিয়া ফিলিকে" (Hetairia Philike) নামে অন্য একটি গুপ্ত সমিতি। ক্রিমিয়া দ্বীপে গ্রীক বণিকরা আলেকজান্ডার ইস্পিলান্টি (Alexander Ipsilanti) নেতৃত্বে হেটাইরিয়া

ফিলিকে (অর্থ Association of Friends বা সুহৃদ সমিতি) গঠন করে। তুরস্ক সাম্রাজ্যে ছড়িয়ে থাকা গ্রীক বণিক ও উচ্চপদস্থ কর্মচারী ফিলিকের পৃষ্ঠপোষকতা করে। তুরস্কের কঠোর নীতির ফলে ফিলিকের আন্দোলন ব্যর্থ হয়। কিন্তু এই আন্দোলনের সূত্র ধরেই মোরিয়া দ্বীপে তুর্কী রাজকর্মচারী ও সৈন্যদের নির্বিচারে হত্যা করা হয়। প্রত্যুত্তরে তুরস্ক বহু খ্রিস্টানকে নৃশংসভাবে হত্যা করে এবং কনস্টানটিনোপলের গ্রীক চার্চের প্রধান পুরোহিতকে কেটে জলে ভাসিয়ে দেয়।

ইউরোপে তখন রোমান্টিক ভাবধারার যুগ। প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী গ্রীসের স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রতি তারা গভীর সহানুভূতিশীল। ফ্রান্স, ইংলন্ড প্রভৃতি দেশে প্রবল জনমত সরকারের ওপর এই মর্মে চাপ সৃষ্টি করল যে তারা যেন তুরস্কের প্রতি তাদের চিরাচরিত নীতি ত্যাগ করে এবং গ্রীকদের সাহায্যে এগিয়ে যায়। গ্রীক বণিকরা ইংলন্ডের ব্যাঙ্ক থেকে প্রচুর অর্থ ধার নিয়েছিল। তাই ইংলন্ডের স্বার্থ ছিল গ্রীকদের রক্ষা করা। নতুন বিদেশমন্ত্রী ক্যানিং গ্রীসে হস্তক্ষেপ করতে এগিয়ে গেলেন।

আসলে গ্রীকদের অভ্যুত্থান নিয়ে একটি আন্তর্জাতিক সমস্যার সৃষ্টি হয়। প্রতিষ্ঠিত সরকারের বিরুদ্ধে কোন প্রজাগোষ্ঠীর মানুষের (Subject people) বিদ্রোহ অস্ট্রিয়ার চ্যান্সেলর মেটারনিক সমর্থন করতেন না। কারণ তাতে জাতীয়তাবাদী বিদ্রোহকে সামর্থন করা হয়। বহুজাতিক রাষ্ট্র হিসাবে অস্ট্রিয়া হাঙ্গেরি তা করতে পারে না। তাছাড়া ইংলন্ড ও অস্ট্রিয়া উভয়ই রাশিয়ার সম্প্রসারণশীলতার ব্যাপারে সন্দিগ্ধ ও ঈর্ষাকাতর ছিল। ১৮২২ সালে যখন রাশিয়ার জার আলেকজান্ডার গ্রীকদের সমর্থনে অগ্রসর হলেন তখন অস্ট্রিয়ার চ্যান্সেলর মেটারনিক ও ইংলন্ডের পররাষ্ট্রমন্ত্রী কাসেলরির (Castlereagh) সম্মিলিত কূটনৈতিক কৌশলে তাঁর সে প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। ইউরোপের শক্তিগুলি নিরপেক্ষ থাকার চেষ্টা করে কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা সম্ভব হয়নি। ইংলন্ডে হেলেনিজম্ (Hellenism) বা গ্রীক সংস্কৃতি সম্বন্ধে স্পর্শকাতরতা ছিল। ইংরাজ কবি বায়রণ (Byron) নিজে গিয়েছিলেন গ্রীকদের হয়ে যুদ্ধ করতে। রাশিয়াতে জার আলেকজান্ডারের উত্তরাধিকারী শাসক নিকোলাস গ্রীকদের সমর্থনে এগিয়ে আসতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন। আর ১৮২২ সালের পর ইংল্যান্ডে কাসেলরির উত্তরাধিকারী হয়েছিলেন উদারনৈতিক নেতা ক্যানিং। রাশিয়া চাইত না গ্রীকদের পরাজয় ঘটুক, ইংল্যান্ডও শেষ পর্যন্ত চাইত না গ্রীক সংস্কৃতির বিনাশ ঘটুক। ফ্রান্সেও আস্তে আস্তে গ্রীকদের সম্বন্ধে সহমর্মিতা গড়ে উঠছিল। শুধু মেটারনিক মনে করতেন যে গ্রীকরা বিদ্রোহী—তাদের ভাগ্য তারাই রক্ষা করবে, অন্য কেউ নয়। প্রাশিয়াও এই মত পোষণ করত। কিন্তু ইউরোপীয় কোন শক্তির ওপর তুরস্ক একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তার করুক এটি কেউই চাইতো না। এই অবস্থায় গ্রীক পরিস্থিতি জটিল হয়ে ওঠে।

১৮২৫ সাল থেকে গ্রীসের স্বাধীনতা যুদ্ধের দ্রুত পটপরিবর্তন হতে থাকে। তুরস্কের সুলতানের অনুরোধে মিশরের প্রায় স্বাধীন শাসনকর্তা মেহমেত পাশা তুরস্কের সাহায্যে এগিয়ে আসেন। মেহমেত আলির পুত্র ইব্রাহিম আলি মোরিয়া আক্রমণ করেন ও গ্রীকদের নৃশংসভাবে হত্যা করেন। এ অবস্থায় ইংলন্ড, ফ্রান্স, রাশিয়া সম্মিলিতভাবে গ্রীসের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করে। তারা সুলতানকে যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব দেন, কিন্তু মেহমেৎ আলির সাহায্য পেয়ে সুলতান এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। তখন ইঙ্গ ফরাসী নৌ-বাহিনী তুর্কী নৌ-বাহিনীকে **নাভারিনো** (Navarino) এর যুদ্ধে বিধ্বস্ত করে (১৮২৭)। তুর্কী নৌ-বাহিনীর ধ্বংস ইংলন্ড ও ফ্রান্সের অভিপ্রেত ছিল না। ইংলন্ড ঐ ঘটনার জন্য তুরস্কের কাছে দুঃখপ্রকাশ করে। ইংলন্ড, ফ্রান্স থমকে গেলে রাশিয়া এককভাবে তুরস্কের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে এবং মোলডাভিয়া ও ওয়ালাচিয়া দখল করে গ্রীসে প্রবেশ করে

ও যুদ্ধ করতে করতে এড্রিয়ানোপল পর্যন্ত অগ্রসর হয়। তুরস্ক বাধ্য হয়ে **এড্রিয়ানোপল-এর সন্ধি** (১৮২৯) স্বাক্ষর করেন। সন্ধির শর্ত অনুসারে তুরস্ক গ্রীসের স্বাধীনতা স্বীকার করে নেয়। ব্যাভেরিয়ার রাজকুমার প্রিন্স অটো গ্রীসের রাজা হলেন। রাশিয়ার তত্ত্বাবধানে মোলডাভিয়াও ওয়ালাচিয়া, প্রদেশ দুটি স্বায়ত্তশাসন লাভ করল। রাশিয়া তুরস্ক সাম্রাজ্যে অবাধ বাণিজ্যিক সুবিধা লাভ করল। ১৮৩০ সালের লন্ডন চুক্তিতে ইংলন্ড, ফ্রান্স, রাশিয়া মিলিতভাবে গ্রীসের স্বাধীনতা স্বীকার করে ও স্বাধীন গ্রীসের সীমানা নির্ধারণ করে দেয়।

গ্রীসের স্বাধীনতা যুদ্ধ সর্বত্র বলকান জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে অনুপ্রাণিত করে।

(গ) ক্রিমিয়ার যুদ্ধ ও যুদ্ধ পরবর্তী অধ্যায়

তুরস্ক সাম্রাজ্যের ক্রমিক অবক্ষয় এবং ঐ অঞ্চলে রাশিয়ার আগ্রাসী নীতি ক্রিমিয়ার যুদ্ধের মূল কারণ। যুদ্ধের সূত্রপাত হয়েছিল কিছুটা তুচ্ছ কারণে— জেরুজালেমে খ্রিস্টানদের পবিত্র স্থানগুলির উপর কর্তৃত্ব নিয়ে রোমান ক্যাথলিক ও গোঁড় খ্রিস্টান (Orthodox Christian বা Greek Christian) যাজকদের মধ্যে বিরোধ থেকে। ১৭৪০ সালের এক চুক্তিতে তুরস্ক ফ্রান্সকে রোমান ক্যাথলিকদের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব দেয়, অন্যদিকে ১৭৭৪ সালের কুচুক-কাইনার্ডজি চুক্তিতে রাশিয়া গোঁড়া খ্রিস্টানদের অভিভাবকত্বের অধিকার পায়। জেরুজালেমের পবিত্র স্থানগুলি নিয়ে বিরোধ দেখা দিলে ফ্রান্সের সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়ন নিজের দেশের লোকেদের মন জয় করার জন্য ক্যাথলিকদের সাহায্যে এগিয়ে যান। অন্যদিকে রাশিয়া গোঁড়া খ্রিস্টানদের পক্ষ অবলম্বন করে। সুলতান উভয়পক্ষকে সন্তুষ্ট করার জন্য কিছুটা চাতুরীর আশ্রয় নেন—কিন্তু কোন পক্ষকেই শেষ পর্যন্ত খুশী করতে পারেন নি।

রাশিয়ার জার প্রথম নিকোলাস মনে করতেন তুরস্ক ইউরোপের 'রুগ্ন ব্যক্তি' (Sickman of Europe)। তিনি বার বার ইংলন্ডকে বোঝাতে চাইছিলেন যে তুরস্কের পতন অনিবার্য ও আসন্ন। এই অবস্থায় ইংলন্ড ও রাশিয়ার উচিত তুরস্কের ভবিষ্যৎ নির্ধারণের জন্য নিজেদের মধ্যে বোঝাপড়ায় আসা। নিকোলাস ইংলন্ড পরিভ্রমণে যান ইংলন্ডের মনোভাব জানার জন্য। কিন্তু ইংলন্ড তার মনোভাব স্পষ্ট করে জানায় নি। এই সময়ে আরও যে কূটনৈতিক আলোচনা হয়েছিল তাতেও ইংলন্ড তার নীতি পরিষ্কার করে ব্যাখ্যা করে নি। জেরুজালেমে খ্রিস্টান যাজকদের বিরোধ, তৃতীয় নেপোলিয়নের স্বার্থচিন্তা, ইংলন্ড ও রাশিয়ার ভুল বোঝাবুঝি ক্রিমিয়ার যুদ্ধের জন্য দায়ী।

রাশিয়া মোলডাভিয়া ওয়ালচিয়া দখল করলে অস্ট্রিয়ার উদ্যোগে ইংলন্ড, ফ্রান্স ও প্রাশিয়া ভিয়েনায় মিলিত হয়ে তুরস্ককে সমস্যা সমাধানের জন্য কিছু প্রস্তাব পাঠায় (Vienna Note)। তুরস্ক ঐ প্রস্তাব অগ্রাহ্য করে যুদ্ধ ঘোষণা করে (১৮৫৩)। যুদ্ধ প্রধানত ক্রিমিয়া দ্বীপে সীমাবদ্ধ থাকে। ইংলন্ড, ফ্রান্স তুরস্কের পক্ষে যোগদান করে। পরে সার্ডিনিয়া-পিডমন্টও মিত্রপক্ষে যোগ দেয়। সেবাস্তপোল-এ রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম ও দীর্ঘ অবরোধের পর রাশিয়া সেবাস্তপোল ছেড়ে চলে যায়। যুদ্ধ, কলেরা, টাইফাস প্রভৃতি মহামারী এবং রাশিয়ার প্রচণ্ড শীতে আট লক্ষাধিক সৈন্য নিহত হয়েছিল। প্যারিসের **শান্তি চুক্তিতে (১৮৫৬)** ক্রিমিয়া যুদ্ধের অবসান হয়।

ইউরোপের বিভিন্ন দেশে ক্রিমিয়ার যুদ্ধের ফল হয়েছিল সুদূর-প্রসারী। আমরা এখানে প্যারিস চুক্তি বলকান জাতীয় আন্দোলনের ওপর যে প্রভাব ফেলেছিল সেই দিকটি নিয়েই আলোচনা করব।

প্যারিস চুক্তির শর্ত অনুসারে তুরস্ক মোলডাভিয়া ও ওয়ালাচিয়া ফিরে পেল। প্রদেশ দুটি স্বায়ত্তশাসনের অধিকার লাভ করে। রাশিয়া বেসারাবিয়ার অংশবিশেষ তুরস্ককে ছেড়ে দিল এবং সার্বিয়ার ওপর অভিভাবকত্বের

দাবী ত্যাগ করল। সার্বিয়ার স্বায়ত্তশাসনের অধিকার আবার স্বীকার করে নেওয়া হল। তুরস্ক তার খ্রিস্টান প্রজাদের প্রতি সুবিচার ও জাতিধর্ম নির্বিশেষে অবস্থার উন্নতির প্রতিশ্রুতি দিল। অন্যদিকে স্বাক্ষরকারী রাষ্ট্রগুলি (ফ্রান্স, ইংলন্ড, অস্ট্রিয়া, প্রাশিয়া, রাশিয়া) তুরস্কের খ্রিস্টান প্রজাদের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করার প্রতিশ্রুতি দেয়। একটি পৃথক চুক্তির দ্বারা ইংলন্ড, ফ্রান্স ও অস্ট্রিয়া তুরস্ক সাম্রাজ্যের অখণ্ডতা ও স্বাধীনতা রক্ষার প্রতিশ্রুতি দেয়।

(ঘ) রুশ-তুরস্ক যুদ্ধ ও বার্লিন চুক্তির পরবর্তী অধ্যায়

প্যারিসের শান্তিচুক্তির পর বলকান অঞ্চলে স্বাধীন গ্রীস এবং স্ব-শাসিত সার্বিয়া ও মোলডাভিয়া ওয়ালাচিয়া অবস্থান স্বীকৃত হয়েছিল। কিন্তু তখনও সার্ব জাতি অধ্যুষিত বসনিয়া, হারজেগোভিনা ও মন্টিনিগ্রো এবং বুলগার জাতি অধ্যুষিত বুলগেরিয়া তুরস্কের প্রত্যক্ষ শাসন অধিকারে ছিল। এড্রিয়াটিক উপসাগরের কূলে আলবেনিয়ায় ছিল দুর্ধর্ষ উপজাতিদের বাস। সেখানকার শাসনকর্তা তুরস্ক কর্তৃক নিযুক্ত হলেও আলবেনিয়া ছিল প্রায় স্বাধীন। পশ্চিম ইউরোপে তখন জাতি-রাষ্ট্র গঠনের প্রবল জোয়ার। আন্দোলনের ঢেউ বলকান অঞ্চলেও পৌঁছায়। সার্বিয়া চাইছিল বসনিয়া, হারজেগোভিনা, মন্টিনিগ্রো, অস্ট্রিয়া হাঙ্গেরী অন্তর্ভুক্ত সার্ব অধ্যুষিত এলাকা এবং ম্যাসিডোনিয়ার সার্ব সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকা নিয়ে বৃহত্তর সার্ব রাষ্ট্র গঠন করতে। বুলগেরিয়াতেও জাতীয় মুক্তি আন্দোলন তীব্র আকার ধারণ করে।

প্যারিসের শান্তি চুক্তির পর তুরস্ক সংস্কারে হাত দেয়। মুসলমান, খ্রিস্টান ও ইহুদী ধর্মযাজকদের বিশেষ শাসনক্ষমতা বাতিল করা হয়, আইনের চোখে সবাইকে সমান অধিকার দেওয়া হয়, দক্ষতা অনুসারে সব জাতি ও ধর্মের প্রজাকে উচ্চ রাজপদে নিয়োগ ও অমুসলমানদের সেনাবাহিনীতে নিয়োগের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয় এবং নির্মম করব্যবস্থা ও বর্বর শাস্তিদান প্রথার সংস্কার করা হয়। কিন্তু মুসলমান ধর্মীয় নেতা ও প্রাদেশিক শাসনকর্তারা এইসব সংস্কার মানতে অস্বীকার করে। ফলে কেন্দ্রীয় সরকার অসহায় বোধ করে এবং শাসনসংস্কার সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হয়। এই পটভূমিতেই বলকান অঞ্চলে নতুন করে সঙ্কট সৃষ্টি হয়।

সঙ্কটের সূত্রপাত হারজেগোভিনায়। তুর্কী রাজকর্মচারীরা সেখানে নির্মমভাবে কর আদায় করত। হারজেগোভিনার উৎপীড়িত কৃষকরা শাসকশ্রেণীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে এবং বহু রাজকর্মচারীকে হত্যা করে। প্রত্যুত্তরে তুর্কী সেনারা নির্বিচারে খ্রিস্টান প্রজাদের হত্যা করে। এবারে বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়ে বুলগেরিয়াতে। বুলগেরিয়রা কিছু তুর্কীকে হত্যা করলে তুর্কী সেনারা বুলগেরিয়ায় বীভৎস হত্যাকাণ্ড শুরু করে দেয়। কেবল একটি এলাকায় আশিটি গ্রামের মধ্যে পনেরোটি বাদে সব গ্রাম ধ্বংস করা হয়। বাটক শহরে আচমেত পাশা নামে এক রাজকর্মচারী প্রথমে শহরে অধিবাসীদের নিরাপত্তার আশ্বাস দিয়ে অস্ত্র সমর্পণ করতে বলে। অস্ত্র সমর্পণ করলে তাদের টাকা-কড়ি দিয়ে দিতে বলা হয়। অর্থ সমর্পণ করা হলে নিরীহ শহরবাসীদের নির্বিচারে হত্যা শুর হয়। হাজারখানেক খ্রিস্টান এক সুরক্ষিত গীর্জায় আশ্রয় নিয়েছিল। তুর্কী সেনারা গীর্জার অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে না পেরে গীর্জার ছাদের টালি উপড়ে ফেলে পেট্রল ভেজানো ন্যাকড়ায় আগুন জ্বালিয়ে আশ্রিতদের গায়ে ছুঁড়ে মারে। গীর্জায় আশ্রিত স্ত্রী-পুরুষ শিশু সকলেই মারা যায়।

বুলগেরিয়ার হত্যাকাণ্ডের সংবাদ ইউরোপে ছড়িয়ে পড়লে প্রবল আলোড়ন সৃষ্টি হয়। ইংলন্ডের উদারনৈতিক নেতা গ্লাডস্টোন দাবী করলেন এবার তুরস্ককে তল্পিতল্পাসহ ইউরোপ থেকে সম্পূর্ণ তাড়িয়ে দিতে হবে। কিছুদিন বৃহৎ রাষ্ট্রগুলির মধ্যে তৎপরতা দেখা গেলেও কোন সক্রিয় পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। এ অবস্থায়